কোথাও পাইলাম না। সংশয়ে, উদ্বেগে মন অন্ধকার হইয়া গেল। বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরে গিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম আনিগণ্ডীর দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত রাজধানীর সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে। নগরীর উত্তর তোরণে বিশ্বাসঘাতকের সেনা সজ্জিত হইতেছিল। পথে ভীতিবিহ্বল চঞ্চলনেত্র এক দূতের সহিত দেখা হইল। সে বলিল, অচিরে আহ্‌মদের সহিত যুদ্ধ বাধিবে, খাদ্যদ্রব্য, তীর, ভল্ল হস্তিপৃষ্ঠে ত্বরায় প্রেরণ করা আবশ্যক। সমবেত নাগরিক-মণ্ডলীকে এই কথা বলিলাম, তাহারা বিশ্বাস করিল। সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, ক্ষমতা ছিল না। যাহারা যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে—নগরে কেবল শুক্লকেশ বৃদ্ধ ও গুম্ফহীন বালক। রাজ-প্রাসাদ একটি দুর্গে পরিণত হইয়াছে।

"ভগবান্ বিরূপাক্ষ একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। গণ্ডীকোটার যুবক সামন্ত পীড়িত বলিয়া সংগ্রামস্থলে যাইতে পারেন নাই। তিনি আপন সেনাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেনাপতি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু আমাকে চিনিতে পারিয়া আর আপত্তি করিলেন না। আমি দক্ষিণ প্রাকার হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার শিবিরে গিয়াছিলাম।

"গণ্ডীকোটা-সৈন্য দক্ষিণ তোরণ অধিকার করিল। বিশ্বাসঘাতক সে-সংবাদ পাইয়া আনিগণ্ডী আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করিয়া রাজপ্রাসাদ রক্ষা করিতে আসিল। গণ্ডীকোটার সেনা পুরী আক্রমণ করিল। আমি কমণ্ডলু তম্বুরাওয়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে সাহায্যের জন্য আসিতে বলিলাম। গণ্ডীকোটা-সৈন্য কিছুই করিতে পারিল না। দুর্বৃত্ত যুদ্ধ করিতে জানিত। রাজপথে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। আমাদের সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

"বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া সবই দেখিতেছিলাম। পশ্চাদ্ধাবনের পর রক্তাক্তদেহে দুর্বৃত্ত ফিরিয়া আসিল। রক্তের আস্বাদ পাইলে ব্যাঘ্র যেরূপ ভীষণ উন্মত্ত হয়, তাহার মূর্ত্তিও সেইরূপ ভীষণ, সেইরূপ হিংস্র। দূরে দেখিলাম, মধুরাও! তোমার পুত্র তম্বুরাও—অশ্বারোহণে—আপনার শ্রেণীবদ্ধ সেনার অগ্রভাগে। দেবসেনাপতি স্কন্দের ন্যায় তরুণ সে মূর্ত্তি, সূর্য্যপুত্র রেবন্তের ন্যায় দীপ্তিমান্! বিশ্বাসঘাতকের সেনাদল ছুটিয়া চলিতেছিল, সর্ব্বপশ্চাৎ দুর্বৃত্ত স্বয়ং। তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এই যষ্টি প্রহার করিলাম। আঘাত অশ্বের স্কন্ধে লাগিল—অশ্ব পড়িয়া গেল। আমিও পড়িয়া গেলাম। জীবনে সেই প্রথম মূর্চ্ছা!

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি, আমি রাজপুরীর এক কক্ষে বন্দী। যষ্টি আমার পার্শ্বে রহিয়াছে। একটি পাত্রে দুগ্ধও ছিল। ভাবিলাম সে দুগ্ধে নিদ্রার—হয় ত বা চির নিদ্রার ঔষধ আছে তাহা স্পর্শ করিলাম না। একবার দুর্গার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, মনে হইল। আবার পরক্ষণেই শুনিলাম, আর্ত্তনাদ ও রণকোলাহল। বুঝিলাম, তম্বুরাও আসিয়াছেন। ক্রমে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা নিকটে আসিল। কক্ষদ্বার খুলিয়া গেল। দেখিলাম, দ্বারপথে তম্বুরাও আহত হইয়া পতিত—দুর্গা বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাঁহার রক্তস্রাব নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

"যৌবনে ক্ষত-চিকিৎসা কিছু কিছু জানিতাম। ভ্রমণ-কালে নানা শিকড় ও

1059

পত্রের গুণ শিক্ষা করিয়াছিলাম। তম্বুরাওয়ের ক্ষত পরীক্ষা করিলাম। সে আঘাতে মানুষ বাঁচে না। আঘাত একটী নয়—শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ন্যায় দেহে অগণ্য ক্ষত। ঔষধ-লেপন করিয়া ক্ষতস্থানগুলি বাঁধিয়া দিলাম। চেতনা আসিলে বীর তাঁহার দেহ আনিগওীতে লইয়া যাইতে বলিলেন।"

সভাস্থ সকলের নেত্রে জল পড়িতেছিল। মারাপ্পার নেত্র শুষ্ক, কিন্তু তাহা ধূমকেতুর কপিশ পিণ্ডের ন্যায় জ্বালাময়। আর মধুরাওয়ের নেত্রও শুষ্ক, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি আকাশের ন্যায় ভাবহীন একটি অসীম শূন্যতায় পূর্ণ।

পথে মধুরাও মারাপ্পাকে বলিলেন, "আমি তাহাকে তথাপি ক্ষমা করিয়াছি, সে ত' আর ফিরিবে না।" মারাপ্পা বলিলেন, "তোমার মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে।"

উৎসব।

[রচনা—শ্রীমতী বেলা গুহ]

নিখিল-ভুবনে একি আনন্দ,
উৎসব-কলরোল!
উতলা করিয়া নিখর হৃদয়
কে দিল এমন দোল!
ঘুচাইয়া দিল সকল দ্বন্দ্ব,
শঙ্কা—সরম, সকল বন্ধ,—
ঝঙ্কারি, উঠে বিশ্ব-বীণায়
একি এ মধুর বোল!
শিশির-সিক্ত লতিকার সনে
কিরণের কোলাকুলি,

অসীমের সাথে মিলিতে সসীম
দিয়াছে পরাণ খুলি!
ফুটে উঠে হাসি সবার আননে,
সুখ-তরঙ্গ ভুবনে ভবনে—
বিরহ-বিধুর অধীর হৃদয়
পেয়েছে শান্তি-কোল!
বিশ্ব সভায় উৎসব আজি
উচ্ছল কলরোল!!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

মালকোষ—চৌতাল।

স্থায়ী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II { র্সণা ণা । র্সা ণা । দা দমা । জ্ঞা মা । দা ণা । —দা র্সা I
নি০ খি ল ভু ব নে০ এ কি আ ন ন্ দ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্মণা -র্সা । র্মা র্জ্ঞা । র্মজ্ঞা র্সা । মা -দা । -ণা -দা । -র্সা -া I
উ০ ৎ স ব ক০ ল রো ০ ০ ০ ০ ল্

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I ণা র্সা । ণা দা । ণা দা মা দা । মা জ্ঞা । মা -জ্ঞ I
উ ত লা ক রি য়া নি থ র হৃ দ য়

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মজ্ঞা মমা । মা জ্ঞা । মা দা । মা -দণর্সা । -দা -ণা । -র্সা -া} II
কে০ দি০ ল এ ম ন দো ০০০ ০ ০ ০ ল্

অন্তরা।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I { মা দা । ণা দা । মা জ্ঞা । মা দা । ণা র্সা । -ণর্সা র্সা I
ঘু চা ই য়া দি ল স ক ল দ্ব ০ন্ দ্ব

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা -ণা । র্সা র্সা । ণা ণা । মা দা । ণদা র্সা । -ণণা র্সা } I
শ ঙ্ কা স ব ম ম ক ম০ ব ০ন্ ধ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I { র্সা -ণা । র্সা র্মজ্ঞা । র্মজ্ঞা র্মা । র্মজ্ঞা র্মা । র্সা -ণা । র্সা -া I
ঝ ঙ্ কা রি০ উ০ ঠে বি০ শ্ব বী ০ ণা য়

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মা র্সা । ণা দা । মা মা । জ্ঞমা -দণা । -র্সর্মা -র্জ্ঞর্সা । -ণদা -ণা} II
এ কি এ ম ধু র বো০ ০০ ০০ ০০ ০০ ল্

সঞ্চারী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II { সা মজ্ঞা । জ্ঞা মা । —া সা । ণ্া সা । দ্া ণ্া । দ্মা ম্া I
শি শি০ র সি ক্ত ল তি কা র স০ নে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I জ্ঞ্া ম্া । ণ্া দ্া । ণ্সা ণ্া । ম্া -দ্া । -ণ্া -দ্া । ণ্া -সা I
কি র ণে র কো০ ণা কু০ ০ ০ ০ লি ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I সা মা । জ্ঞা মা । দা দা । ণা র্সা । র্সা ণা । দা -ণা I
অ সী মে র সা থে মি লি তে স সী ম

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা র্মা । র্জ্ঞা র্সা । ণা মমা । জ্ঞমা -দমা । -দণা -দণা । র্সণা -দমা} I
দি য়া ছে প রা ণ০ খু০ ০০ ০০ ০০ লি০ ০০

আভোগ ।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I { র্সা ণা । দা মা । জ্ঞা জ্ঞা । সা মা । মা জ্ঞা । মা দা I
ফু টে ও ঠে হা সি স বা র আ ন নে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I ণা দা । র্সা পণা । দা -মা । জ্ঞা মা । দা মা । দা ণা } I
সু খ ত রঙ্ গ ০ ভু ব নে ভ ব নে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I { র্সা র্সা । র্মা র্জ্ঞা । র্মা র্মা । র্জ্ঞা র্মর্সা । র্সা র্সণা । ণর্সা র্সা I
বি র হ বি ধু র অ ধী ০ র হৃ ০ দ ০ য়

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মা ণা । দা মা ।-জ্ঞা মা । মা -দা ।-ণা -র্সা ।-ণা -র্সা } I
পে য়ে ছে শা ন্ তি কো ০ ০ ০ ০ ল্

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা -র্মা । র্মা র্মা । র্জ্ঞা -া । ণা -র্সা । র্সা ণা । দা মা I
স্নি ০ গ্ধ স ভা য় উ ৎ স ব আ জি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা -া । ণা ণা । দা মা । জ্ঞমা -দণা ।-র্সণা -র্সজ্ঞা ।-মদা -ণর্সা II II
উ চ্ ছ ল ক ল রো০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ল্

* ‘আস্থায়ী’ শব্দের পরিবর্ত্তে এবার হইতে ‘স্থায়ী’ শব্দটিই ব্যবহার করা হইবে। কারণ এই যে, বহুকাল হইতে পশ্চিম প্রদেশের সঙ্গীতজ্ঞরাই, যাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত জানেন না বলিয়া মনে হয়, আমাদের দেশের সঙ্গীত শিক্ষার্থীদিগকে সঙ্গীত শিখাইয়া আসিতেছেন। ঐ শ্রেণীর শিক্ষিত পশ্চিমবাসী লোকেরা প্রায়ই শোনা যায় যে, ‘স্কন্দ-পুরাণ’কে ‘আস্কন্দ-পুরাণ,’ ‘স্নান’কে ‘আস্নান,’ ‘স্ত্রী’ কে ‘ইস্ত্রী’ ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। সেই হিসাবে তাঁহারা ‘স্থায়ী’ কে ‘আস্থায়ী’ বলিয়া উচ্চারণ করাতে, উহা চলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরাও অনেকে ‘স্কুল্’-কে ‘ইস্কুল্’, ‘স্মিথ্’কে ‘ইস্মিথ্’, ‘ষ্ট্রীট’-ক ‘ইষ্ট্রীট্’, ‘ক’-ফলা’ কে ‘আক-ফলা,’ ‘ঙ-ফলা’কে ‘আঙ-ফলা’ বলিয়া থাকি, আর প্রচলিতও তাহাই হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’র গত কার্ত্তিক-সংখ্যার ১৮৩ পৃঃ সুন্দরভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে।—লেখিকা।

পুস্তক সমালোচনা।

মেয়েদের গীতা। শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।—মূল্য ১।০, বেঙ্গল পাবলিশিং হোম। ৫নং স্থুরমহম্মদ লেন ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। গীতার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। কেবল মাত্র বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার উপযুক্ত বাঙ্গালায় গীতার প্রকৃত ব্যাখ্যা একখানিও আছে বলিয়া মনে হয় না। লেখক গদ্যে লিখিয়া গীতার কঠিন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছেন। দুই একস্থানে রচনা বিকৃতি থাকিলেও মোটের উপর পুস্তকের

ভাষা খুবই সহজ, উপন্যাসের ন্যায় অনায়াসে পাঠ করা যায়। ছাপা আর একটু ভাল হইলেই ভাল হইত। পুস্তকের মূল্য সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় একটু বেশী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাঙ্গালী স্ত্রীলোক কেন অনেক পুরুষের উপকারার্থ সোজা কথায় কঠিন বিষয় বুঝাইতে লেখক যে পরিশ্রম করিয়াছেন,তাহার বিবেচনায় মূল্য মোটেই বেশী নহে। যাহা হউক্ শোকদুঃখে শান্তি দিতে বাঙ্গালীর সহচর পুস্তকখানির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

শোক-সংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বামাবোধিনীর সহকারিণী সম্পাদিকা কুমারী উষাপ্রভা দত্ত গত ১১ই মাঘের মহাপুণ্য দিনে বামাবোধিনী ও আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

বামাবোধিনীর ক্ষীণ জীবনটুকু এত দিন তাঁহারই যত্নে রক্ষিত হইতেছিল। তিনি নিজের চির-অসুস্থ দুর্ব্বল শরীর লইয়া কি করিয়া ইহার সেবা করিতেন, সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইত। শুধু পিতৃকীর্ত্তি বামাবোধিনীর জীবনরক্ষা ও নারীজাতির সেবাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা ও মধুরতা নারীসমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়া চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে। তাঁহার গুণের কথা সামান্য কয়ছত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব। পরে তাঁহার পবিত্র জীবনের কাহিনী প্রকাশ করা যাইবে। ভগবান্ তাঁহার অমর আত্মাকে চির-শান্তি-রক্ষা করুন।

কুমারী উষাপ্রভা দত্তের স্বর্গারোহণে

স্নেহের ভগিনি উষা! আজ মাঘের একাদশ দিবসে শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তোমার পূত এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলে, আজ তোমার সাধনা সফল হইল। তুমি দেহমুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলে, আজ স্বয়ং ভগবান্ তোমাকে অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, তুমি এখন অনন্ত শান্তিধামের যাত্রী হইলে। তুমি সাধু পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সাধ্বী মাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিলে, তোমার ভাই-ভগিনী ও আত্মী-স্বজনের অতুল স্নেহের মধ্যে তুমি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলে। সত্যই তোমার সুন্দর জীবন সদ্যোজাত পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হইয়াছিল। তোমার চরিত্রের সুগন্ধে আমরা সকলে পরিতৃপ্ত হইতাম। তুমি আজীবন দারুণ রোগে ক্লিষ্টা হইয়াও জীর্ণ শীর্ণ দেহখানি লইয়া দুরন্ত রোগের সহিত একদিকে সংগ্রাম, অপরদিকে পবিত্র জীবনলাভের প্রয়াসে কতই না সাধনা করিয়াছ! কঠিন সংযম-ব্রত পালনে তুমি সর্ব্বদা তৎপর ছিলে। একদিনও তুমি আলস্যকে জীবনে স্থান দাও নাই, তুমি আজীবন সাধিকা ছিলে। আজ বলি, ভগিনি! তোমার জন্ম সার্থক হইয়াছে, তুমি সত্যই সাধনায় সফলকাম হইয়াছে। আজ আমরা তোমার জীবনে ভগবানের অপার লীলা দেখিয়া অবাক্ হইতেছি এবং সকলের পিতা পরম পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি আজীবন কুমারী থাকিয়া পুণ্যময় জীবনের প্রভাব বিকীর্ণ করিয়া তোমার পিতৃকুলকে ধন্য করিয়াছ। আজ তোমায় বলি "কুলং পবিত্রম্ জননী কৃতার্থা"। যাও, দেবি যাও, সেই শান্তিধামে যেখানে তোমার পুণ্যশ্লোক পিতা, পুণ্যবতী মাতা, ভগিনী বিভুবালা, আর কত কত গুরুজন, স্নেহের ধন, তোমার প্রাণ প্রিয়জন-তাঁহাদের সকলের সহিত মিলিত হও, পরলোকে দেবতাদের সহিত মিলিত হও, উন্নত স্বর্গলোকে গিয়া তোমার সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার সহিত মিলিত হও! যাহা কিছু মলিন, সে-সকল পরিহার করিয়া পুনরায় স্বগৃহে গমন কর, নূতন তেজোময় দেহের সহিত মিলিত হও।

স্বর্গের দেবতাগণ তোমাকে রক্ষা করুন! যে পথে তুমি অগ্রে চলিলে, সে পথে তোমাকে রক্ষা করুন! সুকৃতিগণ যেখানে থাকেন, তাঁহারা যেখানে গমন করেন, জগৎ-প্রসবিতা তোমাকে সেই স্থানে স্থাপন করুন। ওঁ শান্তিঃ।

[১৩৮]

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 715. March, 1923.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ। ৭১৫ সংখ্যা।	ফাল্গুন, ১৩২৯। মার্চ্চ, ১৯২৩।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

মহিমা।

বিশ্বকেন্দ্র ব্যাপি, যার
পুণ্যগৌরব রাজি রে!
সতত ঘোষিছে তা'র
কীর্ত্তি-দুন্দুভি বাজি রে!
উঠিছে নিয়ত গম্ভীর আরাব,
জানাইতে তা'র মহিমা-প্রভাব,
নিখিল ভরিয়া করুণার ভাব
জাগিছে সতত সাজি, রে!
ভূধরে সাগরে, গহনে, নগরে
অনিলে, অনলে, আলোক, অম্বরে,
পাদপে লতায়, রতন-আকরে
দীপ্ত কিরণ লাজি, রে!
তা'র মহিমায় নিত্য রূপান্তর
হইতেছে এই বিশ্ব চরাচর,
সদা বিকশিত বাহ্য কি অন্তর,
সে সর্ব্বময় বিরাজী রে!
তপনে তাহার কিরণ বিস্তার,
শশাঙ্কে তাহার করুণা-প্রচার,
গ্রহ-উপগ্রহে প্রভাব-প্রসার,
অতুল মহিমারাজি রে!

শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী।

সাধের মালা।

[রচনা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র বড়াল, বি-এল্]

ভৈরবী—একতালা।

ফুল-মালা লয়ে বসে আছি প্রাতে
কা'র তরে, ও গো কা'র তরে!
মৃদু ব'য়ে যায় দক্ষিণ বায়—
তারি কথা মোর মনে পড়ে!

ডেকে ডেকে ওঠে পাপিয়া—
কি সুধা-যামিনী যাপিয়া ;
থেকে থেকে পিক, চায় অনিমিক্ ;
থেকে থেকে কুহু কুহরে !
সহসা কেন গো আঁখিতলে মোর
জল উঠে যেন ছাপিয়া !—
আমি হৃদয়-আবেগ রাখিতে গো নারি
বক্ষের তলে চাপিয়া !

ছুলি ছুলি হাসে মৃদু ফুলগুলি
আমারি নয়ানে চাহিয়া—
সে কি আসিবে না পরিবে না মালা
দিবে না-কি মালা মোর গলে ?
দিন চলে যায় নিশি কাটে হায়
আকুল নয়ন জলে—
সাধের এ মালা প্রীতি-ফুল-ডালা
সব বুঝি যায় বিফলে !!

[স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

০ ১ ২´ ৩
II { দ্‌া ণ্‌া ণ্‌া । সা সা সঋা I ণ্‌া জ্ঞা ঋা । ঋা সা সা ।
ফু ল মা লা ল রে০ ব সে আ ছি প্রা তে

০ ১ ২´ ৩
। সা -ঋা ঋা । ঋা সা ণ্‌া I সা -জ্ঞা ঋা । সজ্ঞা -া -ঋসা ।
কা হ্ ত রে ও গো কা দ্ ত রে০ ০ ০০

০ ১ ২´ ৩
। সা ঋা ঋা । ঋা ঋা -জ্ঞা I সা -জ্ঞা- ঋা । সা ণ্‌া দ্‌া ।
মৃ ছ ব রে যা য় দ ০ ক্ষি ণ বা য়

০ ১ ২´ ৩
। দ্‌া ণ্‌া সা । সা ঋজ্ঞা -মা I জ্ঞা জ্ঞা ঋা । সা -া -া } II
তা রি ক থা মো০ য্ ম নে প ড়ে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
II { মা দা দা । দা দা ণা I ণা র্সা র্সা । -া -া -া ।
ডে কে ডে কে ও ঠে পা পি য়া ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
[র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্ঋা র্সা]
। র্ঋা র্ঋা র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I ণা র্সা র্সা । -া -া -া } ।
কি সু ধা যা মি নী যা পি য়া ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্সর্ঋর্জ্ঞর্মা র্মা । র্মা র্মা -া I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা । র্ঋা র্মর্জ্ঞ -া ।
থে কে ০ ০ ০ থে কে পি ক্ চা য় অ নি মি০ ক্

০ ১ ২´ ৩
। দা দা পা । র্সা র্ঋা র্জ্ঞর্সা I র্জ্ঞা র্ঋা র্সা । -া -া । II
থে কে থে কে কু হু ০ কু হু রে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
II { র্সা র্ঋা র্সা । ণা ণা দা I পা ণা দা । পা মা -া ।
স হ সা কে ন গো আঁ খি ত লে মো র্

০ ১ ২ ৩
। মপা -দা পা । মা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা ঋা মজ্ঞা । (-া -া -ঋসা) } ।
জ০ ল্ উ ঠে যে ন ছা পি য়া০ ০ ০ ০০

৩ ০ ১ ২´
। -া -া ঋসা । { সা ঋা ঋা । ঋা ঋা -জ্ঞা I সা জ্ঞা ঋা ।
০ ০ আমি হৃ দ য় আ বে গ্ য়া খি তে

৩ ০ ১ ২´
। সা ণ্দা দা । দা -ণ্া সা । ঋা জ্ঞা মা I জ্ঞা ঋা সা ।
গো না০ রি ব ০ ক্ষে র ত লে চা পি য়া

৩ ৩
। (-া -া ঋসা) } । -া -া -া II
০ ০ 'আমি' ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
II { মা দা দা । দা দা পা I ণা র্সা র্সা । -া র্সা র্সা ।
হু লি হু লি হা সে মৃ হু হু ল্ গু লি

০ ১ ২´ ৩
[র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা র্সা]
I র্ঋা র্ঋা র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I ণা র্সা র্সা -া -া } ।
আ মা রি ন য়া নে চা হে য়া০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। { র্সা র্সর্ঋর্জ্ঞর্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্জ্ঞা র্সর্জ্ঞা ।
সে কি ০ ০ আ সি বে না প রি বে মা লা গা০

০ ১ ২´ ৩
। দা দা ণা । র্সা র্ঋা র্জ্ঞর্সা I র্জ্ঞা -া র্ঋা । র্সা -া } } ।
দি বে না কি মা লা০ মো র্ গ লে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
|| র্সা র্সা র্জ্ঞা | র্ঋ র্সা ণা -া I র্সা র্সা ণা | দপা মা -া |
দি ন চ লে০ যা য় নি শি কা টে০ হা য়

০ ১ ২´ ৩
| মা মপদা দা | পা মা মা I জ্ঞা -রা মজ্ঞা | -া -া -ঋসা |
আ কু০০ ল ন য় ন জ ০ লে০ ০ ০ ০০

০ ১ ২´ ৩
| সা ঋা ঋা | ঋা ঋা জ্ঞা I সা জ্ঞা ঋা | সা ণ্দা দা |
সা ধে র এ মা লা প্রী তি ফু ল ডা০ লা

০ ১ ২´ ৩
| দা দা ণা | আ সঋা -জ্ঞসা I জ্ঞা ঋা সা | -া -া || IIII
স বি বু ঝি যা০ ০য় ঝ ক লে ০ ০ ০

ইন্দিরা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সুসজ্জিত পুরাতন বৈঠকখানায় রাজা রাজানারায়ণ আসীন)

রাজা। (চিন্তাযুক্ত ভাবে) কি ভাবে বাল্য কাল কাটল, কোথা হতে যৌবনে এত ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রে অপার সুখের অধিকারী হয়েছিলাম, আবার ভাগ্যদোষে সব হারালাম, সব গেল! যা আছে, তাও যায় যায়! এখনি হয়ত' যাবে! আঃ হাঃ—মা লক্ষ্মী তুমি চঞ্চলা! কিন্তু এত যে চঞ্চলা তা জান্‌তাম্ না! (ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া) সব গেল, সব গেল; ধন গেল, মান গেল, সুখ গেল, স্বাস্থ্য গেল। অকালে গৃহিনী প্রাণত্যাগ করল, অভাগিনী শিশু-কন্যা ফেলে চ'লে গেল! কত যত্নে কত অর্থব্যয় করে তাকে মানুষ করলাম; তার মুখ চেয়ে সকল দুঃখ দূর হয়েছিল! এখন তাকে দেখলে যে আমার দুঃখ শতগুণ বৃদ্ধি পায়! আঃ—মাগো ইন্দিরা, তোর কি হবে! এখনও পাত্রস্থ করতে পারলাম না!!! হায়! হায়! বিধাতঃ—লীলাময় দেবতা! এ সুর-পারিজাত কি অযত্নে শুকাবে? আঃ,—জীবন ঘোর মত্ততায় গেল, শেষ দশায় দীনবন্ধু, দেখা দাও, দেখা দাও! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুরের কাছে উকিল বাবু আসতে চান্।

রাজা। কে? কমল? কেন? কি দরকার? (ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া) আচ্ছা! তাঁকে নিয়ে এস।

(কমলকুমারের প্রবেশ।)

কমল। (প্রণাম করিয়া) শুনলাম আপনি

নাকি এই বাড়ীবাগান পুষ্করিণী, এই জায়গা অর্থাৎ এই লক্ষ্মীপুরগ্রাম পর্য্যন্ত বিক্রি করবেন, মতলব করেছেন ?

রাজা। কেন বল দেখি ? এ গ্রামে এর খরিদ্দার কই কেউ আছে ?

কমল। হাঁ আছে।

রাজা। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) কে ?

কমল। আমি।

রাজা (ত্রস্তভাবে) চুপ চুপ্, আমি যে বিক্রি করব তা সকলে জানে এ আমার ইচ্ছা নয়। গোপনে গোপনে বিক্রির দরকার। তুমি কা'র মুখে শুনলে ?

কমল। আপনার দেওয়ানজীর মুখে শুনেছি। আর কোন লোক বোধ হয় জানে না। তিনি আমায় গোপনে খবর দিয়েছেন। আপনার যদি কষ্টবোধ হয়, আমিও আর কাউকে জানাব না। এ বিষয়ে যেরূপ লেখা-পড়া দরকার সমস্তই গোপনে গোপনে করা হবে। কত দর দেওয়া হয়েছে ?

রাজা। দুই লক্ষ মুদ্রা।

কমল। কালই ঐ টাকা আপনার হস্ত-গত হবে ও দস্তুর মত লেখা-পড়া করা হবে। আপনার সম্মতি আছে ত ?

রাজা। (দীর্ঘশ্বাসের সহিত) সম্মতি আছে।

কমল। আজ তবে বিদায় নিই, কাল আস্‌বো।

রাজা। বাবা! অম্‌নি মুখে যাওয়া হবে না; কিছু মিষ্টি মুখ করে যেতে হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওমা ইন্দিরা!

(নেপথ্যে—'কেন বাবা ?' তৎপরে
ইন্দিরার প্রবেশ)

ইন্দিরা। আমায় ডাক্‌ছো কেন বাবা ?

রাজা। মা, ভাণ্ডারীকে এর কিছু জল-যোগের ব্যবস্থা কর্ত্তে বল। ইনি আমাদের পরম বন্ধু ও অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক। তোমার লজ্জা করবার আবশ্যক নেই, মা, এ দিকে এস।

ইন্দিরা। আচ্ছা, আমি ভাণ্ডারী দিদিকে বলে আসি। (প্রস্থান)

কমল। (স্বগত) একি দেবী-প্রতিমা! কি দেখ্‌লাম!

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। খাবার জায়গা হয়েছে, গা তুলতে আজ্ঞে হয়।

রাজা। চল, বাবা, কিছু খেয়ে এস।

(সকলের প্রস্থান।

২য় গর্ভাঙ্ক।

(ইন্দিরার সুসজ্জিত ঘর; ইন্দিরা আসীন)

ইন্দিরা। (স্বগত) কাল ঠান্‌-দিদির বাড়ী নেমন্তন্নে গিয়ে বড় রাত হয়ে গিয়েছিল। বাবাকে অনেকক্ষণ একা থাকতে হয়েছে। আহা মা মরণ-কালে আমায় যে পদকখানি দিয়ে গেছেন, সেটি ভেঙ্গে যাওয়াতে বড় দুঃখ হয়েছিল। মা বলেছিলেন, "ওখানি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখ্‌বে ; ওখানি নষ্ট হলে বিপদ্ সন্নিকট জানবে।" যখন ঠানদিদির নাতি সেই যুবা পুরুষটি পদকখানি দেখ্‌তে চেয়ে হাত পাত্‌লেন, দিতে গিয়ে আমার কেমন হাত কাঁপ্‌ল,সেটি মাটিতে প'ড়ে দু'খানা হয়ে গেল! সেই সময় মার কথা মনে প'ড়ে, বুকটা যেন দুর্ দুর্ করতে লাগ্‌ল। তিনিও খুব লজ্জিত হলেন, সেই মুখখানি কেবল মনে পড়্‌চে।

(রাজনারায়ণের প্রবেশ)

রাজা। ইন্দিরা! কি করব মা—আমার শরীর মন বড় অবসন্ন বোধ কচ্চি, একটু বীণা বাজিয়ে গান শুনাও না, মা! দু'দণ্ড রোগের যন্ত্রণা ভুলে থাকি।

ইন্দিরা। তোমার শুন্‌বার ইচ্ছা হচ্চে, বাবা! তবে বাজাই।

(রাজনারায়ণের কক্ষে উপবেশন ও ইন্দিরার বাদ্যসহ সঙ্গীত)

ইন্দিরা। (গীতান্তে) বাবা! কমল-দাদা সেদিন বলছিলেন প্রসাদ দাস আমায় যিনি বাজনা শেখান, তাঁকে অনেক পরিবার প্রতিপালন কর্ত্তে হয়। তিনি বড় গরীব। এক বেলা বই খেতে পান্ না, তাও অতি খারাপ খাওয়া! তুমি যদি বল, বাবা আমি তাঁকে একটা গান বাজনার স্কুল খুলতে বলি; গ্রামের ধনী লোকেরা কিছু করে চাঁদা দিন্, তুমিও কিছু দাও।

রাজা। আমরা যে গরীব মা!

ইন্দিরা। না বাবা, আমার কথা কাটালে হবে না, তোমাকে চাঁদা দিতেই হবে।

রাজা। আচ্ছা, তোমার যদি একান্ত ইচ্ছা হয়, তাই হবে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) আহা! মা আমার সরলা, কিছুই জানেন না। পিতা যে তোর এখন কাঙ্গাল হয়েছে মা! লোকে এখনও আমায় রাজা বলে, তাই আমার ইন্দিরা জানে সে রাজকুমারী! কিন্তু ভিতরে কি যে অবস্থা, তা ইন্দিরার কাছে সবই অন্ধকারে ডুবে আছে। সে কথা ব'লে আর ওর সরল বাল্যভাব বিনষ্ট করে ওকে চিন্তাকুল কর্ত্তেও ইচ্ছে হয় না। মাতৃহীনা হয়ে অবধিতো সর্ব্বদাই ওর ম্লান মুখই দেখ্‌তে পাই। আর ওকে ভাবনার ভার দিতে মন সরেনা।

৩য় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্কর চন্দ্রের উদ্যান।

(কন্যা বাসন্তী আসীন।)

বাসন্তী। আজ ক'দিন কি হয়েছে, সর্ব্ব-দাই মন চঞ্চল থাকে, কিছুই ভাল লাগে না! প্রাণে কেবলি অভাব বোধ করি; কিসের অভাব, কার অভাব, সকলি বুঝ্‌তে পেরেও যেন পারি না। (ভ্রমণ)আজ পূর্ণচন্দ্র আকাশে কি শোভাই বিস্তার করেছে। মরি মরি! পৃথিবী যেন হাস্‌চে। প্রকৃতি দেবী বিমল শুভ্র বসন পরিধান ক'রে পরিমলযুক্ত কুসুমমালা গলায় দিয়েছেন। যে দিকে চাই যেন সেইদিকেই চাঁদের হাসিরাশি ছড়িয়ে পড়্‌চে! এত সৌন্দর্য্য পৃথিবীর কোথা হতে!—(সঙ্গীত) (সঙ্গীত সমাপনান্তে) যাই মার কাছে যাই; একাটি পড়ে আছেন। দাদা নিরুদ্দেশে হওয়া অবধি, মা'র আমার আর সে প্রফুল্লতা নাই, শরীরে সে শক্তি ও নাই; দিন দিন-ই ক্ষীণ হয়ে যাচ্চেন! দেহের সে কান্তি কোথায় চলে গেছে! এক মাত্র রোদনই তাঁর সার হয়েছে। ক্রমেই রুগ্ন হয়ে পড়্‌ছেন। (প্রাচীরপার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) কমল! কমলকে দেখ্‌লেই আমার হৃদয় নৃত্য করতে থাকে। যতক্ষণ দেখি, তত-ক্ষণই ভাল থাকি; কিন্তু মুখে এভাব কোন মতেই প্রকাশ করতে পারি না; আমার মনের ভাব কমল এখনও কিছুই জানে না। এই যে কমল এই দিকেই আসচে।

(কমলের প্রবেশ)

কমল। বাসন্তি! তুমি এখনও বাগানে

বেড়াচ্চ। তোমার বাবা টের পেলে বক্‌বেন যে!

বাসন্তী। তুমি না কোন্ দেশে বেড়াতে গিয়েছিলে? কবে এলে? তুমি না থাকায় আমাদের পাড়াটা যেন অন্ধকার হয়েছিল।

কমল। (হাসিয়া) এখন আলো হয়েছে?

বাসন্তী। হয়েছে বৈকি; মা প্রতিদিন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন্।

কমল। তোমার মা কেমন আছেন?

বাসন্তী। (দীর্ঘশ্বাস) তেমনিই, বরং আরও কাহিল হয়েছেন। বাবার ভয়ে মুখে চুপটি করে থাকেন, অন্তরে সর্ব্বদাই যেন দগ্ধ হচ্চেন।

কমল। তোমার বাবা কি এখনও প্রশান্তর নাম শুনলে রেগে ওঠেন্।

বাসন্তী। সে কথা আর বল কেন, এক দিন মা'র ঝি ভুলে বলে ফেলেছিল, 'অমুক জিনিষটা প্রশান্ত দাদাবাবুর ঘরে আছে।' বাবা শুনে রেগে অস্থির! তাকে এমনি কল্লেন যে মেরে মারতে বাকি রেখেছিলেন। আবার এক-দিন সে ভুলে দাদার নাম করাতে সেদিন আর তাকে কোনমতে ক্ষমা কর্‌তে পাল্লেন না, বল্লেন আমার বাড়ীতে সে নাম যে কর্ব্বে, তাকে বাড়ীর বার করে দেবো। এই ব'লে তাকে বিদেয় ক'রে দিলেন।

কমল। সত্যি নাকি? শুন্‌তে বড়ই কঠিন বটে, কিন্তু তাঁর ন্যায়পরায়ণতার অদ্ভুত ক্ষমতা! এ ক্ষমতা না থাক্‌লে তিনি এত ভাল বিচারক হতে পার্ত্তেন না। সকলেই এক বাক্যে তোমার পিতার প্রশংসা করে।

বাসন্তী। বাবা নাকি বলেছেন, দাদাকে পেলেই তিনি সন্তানের মায়া না করে কর্ত্তব্য-বোধে তাঁকে আসামী ব'লে ধরিয়ে দেবেন। মা'র প্রাণে যে এতে কি হয়, তাতো বুঝতে পারছ।

কমল। তা বটেই তো! তাঁর বড় কষ্ট! যাক্, ওকথা তুলে আর মনে কষ্ট করে কি হবে! আমার ভ্রমণের কথা শুনবে না?

বাসন্তী। আমি বড় ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুন্‌তে ভালবাসি, বলনা।

কমল। আজ অনেক জায়গায় যেতে হবে, আর একদিন এসে বল্‌বো। তোমার জন্যে এক জিনিষ এনেছি।

বাসন্তী। কই কি জিনিষ? আর কার কার জন্যে কি কি এনেছ?

কমল। আর দিদির জন্য কঙ্কন এনেছি। (বাক্স খুলিয়া) তোমার জন্য দিল্লি থেকে এই হার এনেছি। কেমন পছন্দ হয়? তোমার মার জন্যে এনেছি আসন।

বাসন্তী। দিদির গয়নার গড়ন বড় পরিষ্কার—কেমন কাজ দেখ!

কমল। এস পরিয়ে দি, তোমার মাকে দেখাও গে। (কণ্ঠে হার প্রদান) আর বলবে আমি তোমাকে কিছু কখন দিই না? (হাস্য)

বাসন্তী। (লজ্জামুখ অবনত করিয়া স্বগত) আমি যা, 'চাই তা' তুমি জাননা। (প্রকাশ্যে) না, এখন আর তা বল্‌বনা বটে।

কমল। আবার তা বল্‌ব না বটে কি? (অন্যমনে) আজ অনেক রাত্ হয়ে গেল, যাই। তুমি ঘরে যাও। (প্রস্থান)

বাসন্তী। (কমলের পশ্চাতে দেখিতে দেখিতে স্বগত) কমল! এ উপহার যে আমার কি আদরের তা কি বল্‌ব! (চাঁদের দিকে চাহিয়া) চাঁদ তুমিই সাক্ষী। যাই মাকে দেখাই। মার তিন সন্তানের মধ্যে একা আমি আছি;

আমার আহ্লাদ দেখলে মার আনন্দের সীমা থাকে না। (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(করুণাময়ীর শয়ন কক্ষ। করুণাময়ী শয়ানা। বাসন্তীর প্রবেশ।)

বাসন্তী। দেখ মা, কমল আমার জন্তে কি এনেছে, কি সুন্দর গড়ন, এখানে এমন গ'ড়তে পারেনা, না মা? (মাতাকে হার প্রদান।)

করুণা। কই দেখি? কমলের মত এরূপ ছেলে আমি কখন দেখিনি; বাছার সকলকে যত্ন, সকলকে ভালবাসা। কমল সকলেরই আপনার। কমলের গুণে মুগ্ধ নয় গ্রামের মধ্যে এমন লোক নাই। (স্থির হইয়া) বাসন্তি! ইনি কি তাস খেলে এখনও আসেন্নি? কত রাত্ হল?

বাসন্তী। না,মা, বাবা এখনও আসেন্ নি। তার প্রতিদিনই এর চেয়ে রাত্ হয়। মা তুমি স্থির হয়ে একটু শুয়ে থাক; আমি এই খানে জানালায় একটু বসি।

করুণাময়ী। আমার বড় পিপাসা বোধ হচ্চে, একটু জল দাও মা।

বাসন্তী। এত রাত্রে আর ঠাণ্ডা জলটা খেয়ে কাজ নেই মা, আবার সর্দ্দি হবে, অসুখ্ বাড়্বে; এখন একটু চুপ করে থাক মা। আর একটু পরে ওষুধ দেবো, তখন জল ত' খাবেই। (করুণাময়ীর স্থিরভাবে শয়ন; জানালার নিকট বাসন্তীর উপবেশন।)

বাসন্তী। আর কণ্ঠহার, আমার আশার মুকুল, আমার সঙ্গের সাথী। (জানালার অপর পার্শ্বে বৃক্ষান্তরালে একটী মূর্ত্তির আবির্ভাব ও অকস্মাৎ বাসন্তীর তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত, চমকিত হইয়া) ওকি! কি নড়্চে ওটা? কি যেন একটা পদার্থ গাছের পাশে ছিল, ক্রমেই আমার দিকে আস্চে; এই বার বুঝি স্থির হল, না—আবার নড়্চে, একবার অগ্রসর হচ্চে আবার পেছুচ্ছে! উঠে একবার দেখ্তে হল, যাই হোক, সকলে বলে এখানে একটা ভূত আছে। আমার ত' ভূতের ভয় করেনা, দেখি ওটা কি। (গৃহ ত্যাগ করিয়া উদ্যানে অগ্রসর হইয়া) কাছে যেন যেতে ভয় হচ্ছে, কিন্তু ভয় বা কিসের? আমার আর কি করবে (নিকটস্থ হইয়া) কোন মানুষের প্রেত আত্মা নাকি। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ডাক্চে যে যাই সাহস করে (প্রকাশ্যে) তুমি কে?

মূর্ত্তি। বাসন্তি! আমি। (পাগড়ীটা খুলিয়া) ভয় পেওনা প্রেতাত্মা নয়,—আমি, তোমার সঙ্গে দেখা করবো বলে এসেছি।

বাসন্তী। দাদা!! দাদা!! তুমি এখানে? কেউ দেখ্তে পাবে যে, কি করে এখানে এলে? কেউ দেখ্তে পায়নি তো? মা তোমার জন্যে ভেবে ভেবে কেঁদে অস্থিচর্ম্ম সার হয়েছেন, বাবার ভয়ে তোমার নামটি কারো কর্‌বার যো নেই।

প্রশান্ত। মার কাছে একবার নিয়ে চল্না বাসন্তি, আমি মাকে কত দিন দেখিনি।

বাসন্তী। (চমকিত ভাবে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ পদ হইয়া) না, না, তুমি কেন এলে? ধরা পড়্বে যে, এত দিন কোথা ছিলে?

প্রশান্ত। বাসন্তি! তবে শোন্ আমার সব কথা বলি। আমি প্রকৃত আসামী নয়, আসামী ধরণী।

বাসন্তী। কে? (আশ্চর্য্যান্বিতভাবে অবস্থান)

প্রশান্ত। ধরণী সেই হালদারকে খুন করেছে, আমি করি নি।

বাসন্তী। (হর্ষ-বিষাদে জড়ীভূত হইয়া) যথার্থ কি তাই?

প্রশান্ত। যথার্থই তাই, আমি শপথ করে বল্‌চি। (ঊর্দ্ধদৃষ্টি ক'রে) অনন্ত আকাশ সাক্ষী, চন্দ্র-তারা সাক্ষী, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর সাক্ষী!

বাসন্তী। সেকথা কোন কাজে লাগ্‌বে না। আমি বিশ্বাস করবো কিংবা মা করবেন, তাতে কি ফল হবে? কোন মানুষ সাক্ষী আছে কি?

প্রশান্ত। হাঁ আছে, হরি সাক্ষী, গোপালও দেখেছে।

বাসন্তী। কোন্ হরি? কে গোপাল?

প্রশান্ত। ঐ হরিদাস রায়, গোপাল এখন কোথা জানি না।

বাসন্তী। হরি আর গোপালকে কেমন করে পাওয়া যাবে? আর ধরণীই বা কোথা? এর সত্য বিবরণ কি?

প্রশান্ত। সত্য এই, আমি একদিন রাত্রে গোলাপের আহ্বানে তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তার বাবাকে আমার বন্দুকটা ধার দেব বলেছিলাম তাই সেটা নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্‌তে সে দরজা খুললে—বন্দুক নিয়ে তুলে রাখ্‌লে। তারপর আমি কৌতূহলী হয়ে কাছে একটা গাছে লুকিয়ে দেখবার জন্য রইলাম। খানিক পরে একটা আওয়াজ শুনে ছুটে গিয়ে দেখি, গোলাপের বাবা রক্তাক্ত দেহে ধূলোয় লুটুচ্ছেন, আমি কাছে যেতে না যেতেই তিনি প্রাণত্যাগ কল্লেন। দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, থর থর করে বুক কাঁপতে লাগ্‌লো। আবার দেখি না আমার নাম-লেখা পিস্তল তাঁর পাশে পড়ে আছে। আমি ভাবলাম আমার পিস্তল দেখে যদি লোকে আমাকেই সন্দেহ করে! তাই সেটা কুড়িয়ে যেমন দৌড়ে আস্‌বো, হালদারের মৃত দেহের উপর পড়ে গেলাম। পাছে কেউ দেখে, তখনি পিস্তল ফেলে আবার দৌড়ে চলে এলাম। পথে হরি আমায় দেখেছিল, গোপাল সেই গাছের ওপরই ছিল! আগে থেকে সে সবই দেখেছে, তারপর সে ভয়ে কোথা পালাল, কেউ জানে না। গুজব হল আমিই হালদারকে খুন করেছি, ভয়ে আমি দেশান্তরে চলে গেলাম। আমার জন্যে চারদিকে লোক ঘুরতে লাগ্‌লো। কিছু দিন গেলে যখন শুন্‌লাম লোকের হুজুগ কমে এসেচে, আস্তে আস্তে দেশে এসে একটা গাড়ীর কারখানায় সামান্য মজুরী করে দিন গুজরান করতে লাগ্‌লাম। সমস্ত দিন যে কি রকম পরিশ্রম, তা আমার আকার দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্চ?

বাসন্তী। দাদা! তুমি অপবাদের ভাগী হয়ে এই কষ্ট ভোগ করচ? তোমার শরীর কি হয়ে গেছে! মা দেখ্‌লে যে কি করবেন তাই ভাব্‌চি। তুমি বাড়ী ত্যাগ করা অবধি ত' তিনি সর্ব্বত্যাগী হয়ে আছেন, আবার যদি শোনেন তাঁর কত আদরের ধন, আঁধার ঘরের মাণিক মুটে-মজুরের কাজ করে, এক মুঠো ভাতের জন্য লালায়িত, তা হলে আরো কি যাতনা পাবেন! জগদীশ্বর! এ দুঃখের নিশি কখন কি পোহাবে না? (দীর্ঘশ্বাস)

প্র। বাসন্তি! মাকে একবার দেখে যাব না?

বাসন্তী। আজ নয়, কাল নিয়ে যাব।

প্রশান্ত। তবে আজ যাই?

বাসন্তী। এস দাদা তবে। (উভয়ের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(রাজা রাজনারায়ণ রায়ের প্রাসাদ।
শয়নাগারে রাজনারায়ণ শয্যাগত, পার্শ্বে
তাঁহার দিকে নতভাবে ইন্দিরা
দণ্ডায়মানা)

ইন্দিরা। বাবা! এতই কি অসুখ কচ্চে তোমার? একবার খালি আমি গান শুন্‌তে যাব বাবা, তুমি একবার অনুমতি দাও না আমায়, বাবা। কি বলচ? যাব কি?

রাজা। (মুদ্রিত চক্ষু একবার চাহিয়া) যা-বে? তোমার একান্ত ইচ্ছা?

ইন্দিরা। হুঁ বাবা! আমি শীগ্‌গির আস্‌বো। তুমি একটু স্থির হয়ে শুয়ে থাক।

রাজা। (ইন্দিরাকে সজ্জিত দেখিয়া) আজ এত সাজ কেন মা? এত হীরে মুক্ত এখন কেন পরেছ? (আহা হা)

ইন্দিরা। সেখানে আজ সবাই সুসজ্জিত হয়ে যাবে। তোমার মেয়ে হয়ে আমার তার মধ্যে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ না হ'লে ভাল দেখাবে না যে, বাবা।

রাজা। (ওহো—হো-হো) তাই, আচ্ছা, তবে এখন এস। (ইন্দিরার প্রস্থান)

(দাসীর প্রবেশ ও জনান্তিকে।)

দাসী। রাজকুমারীর হুকুম—'যতক্ষণ না আসি, এখানে বসে থাক।' আপনি গেলেন মজাকরে গান শুন্‌তে, তুই হতভাগী এই রোগার কাছে মুক বুজিয়ে বসে থাক্, কথা না কইলে পেরাণডা যে হেঁপিয়ে ওঠে! (শয্যার দিকে চাহিয়া) আজ একটা পাখী পুকুর-ধারে বল্‌ছিল যে মিত্তু উ—উ হোক্, মিত্তু হোক। কার মিত্তু হবে গো! আমার যেন না হয়। আমার পেটের এই দশগণ্ডা বছর বয়েস বই ত না, আমার আয়ির এক কম পঁচিশ গণ্ডা হয়েছিল, আমারি বা তা হবে নি কেনে?

রাজা। ও মা, মাগো ইন্দিরা, আমার প্রাণ যে কেমন কচ্চে মা। কে আছ? আমার ইন্দিরা কোথা! (আ—হা—হা)

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। এখনো কি তেমনি অস্থির হচ্চেন?

দাসী। একটু চুপ করেছিলেন, আবার কেমন যেন কচ্চেন।

ভৃত্য। আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠাই। আর রাজকুমারীকে খবর পাঠিয়ে দি, গাড়ী নিয়ে যাক্। (প্রস্থান)

রাজা। আঃ প্রাণ—যায়,—মা—আ—আ ইন্দিরা—আ। (মৃত্যু)

(ক্ষণপরে ইন্দিরার প্রবেশ)

ইন্দিরা। (পায়ে হাত দিয়া, ওড়না দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া) বাবা, এই যে আমি এসেছি। কথা কচ্ছ না কেন বাবা? চেয়ে দেখ, বাবা! আমি যে—

(ডাক্তার ও কমলের প্রবেশ।)

ও গো তোমরা দেখনা গো, বাবা যে মূর্চ্ছা গেছেন, মুখখানি যে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে! কি করি গো!!!

কমল। ইন্দিরা! তুমি ও ঘরে যাও নইলে ডাক্তারের দেখ্‌বার সুবিধা হচ্চে না।

ই। এঁ্যা, আমি এখান থেকে যাব? ভাল করে দেখবেন? আচ্ছা! তবে যাই। (প্রস্থান)

ডাক্তার। আর কেন? জীবনলীলা শেষ হয়েছে, এইবার যা কর্‌বার করা হোক্, মিছে বিলম্ব না হয়। আহা, বৃদ্ধ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। আমি তবে যাই। (প্রস্থান)

(দাস-দাসী ও কয়েক জন লোকের প্রবেশ)

কমল। দেওয়ানজী, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার যথাবিধি আয়োজন করুন।

দেওয়ান। আজ্ঞা হাঁ, সমস্তই আয়োজন হয়েছে, জ্ঞাতি ও উত্তরাধিকারী দেবনারায়ণ বাহাদুরকেও সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

কমল। আমি তবে আমার দরকারী কাজ শেষ করে বাড়ী থেকে আসি। ইন্দিরা না জানি এ নিদারুণ সংবাদে কতই কাতর হচ্ছে! যাই একবার তাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে যাই। (প্রস্থান)

(ইন্দিরার কক্ষ—ধূলধূসরিতা কাতরা ইন্দিরা,—দাসী তারা শুশ্রূষায় নিযুক্তা)

ইন্দিরা। আমার যে আমার বলতে জগতে আর কেউ নেই গো! বাবা, তুমি আমায় কার কাছে রেখে গেলে, আমি যে চার দিক্ শূন্য দেখ্‌ছি যে, বাবা! তোমার এত আদরের, এত স্নেহের ইন্দিরার আজ সব শেষ! মা নেই, বাবা গেলেন। হতভাগিনীর ত্রি-সংসারে আর কেউ রইলো না গো!

তারা। রাজকুমারি, এ-সময় আপনি এত অধীর হ'লে হ'বে না; যা' হ'বার ত' হ'লো, এখন ধৈর্য্য ধরতেই হবে।

ইন্দিরা। তারা! সৎকারের আয়োজনের সময় বাইরে আবার কিসের গোল?

তারা। উঃ—রাজকুমারি! তা আর এখন আপনার শুনে কাজ নেই, আর আমাদের যেমন কপাল, চারদিক্ থেকে পাওনাদার এসে বাড়ী ছেঁকে বসেছে। দেওয়ানজীর সঙ্গে গোলমাল কচ্ছে।

ইন্দিরা। দেনা—!! বাবার এত দেনা? উঃ কি বিপদ্! কে বল্‌ছে যেন শোন ত 'রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা কর্‌বো।'

(নেপথ্যে 'পাওনাদার পাওনার সম্বন্ধে রাজকুমারী কি বলেন শুনতে চাই'।

সবেগে একজনের প্রবেশ—)

পাওনাদার। ভোর থেকে ধন্না দিয়ে আছি, দেওয়ানজী কিছুই কর্ত্তে রাজি নয়, কাজেই রাজকুমারীকে জানাচ্ছি।

ইন্দিরা। আমাকে কি করতে হবে? আমার কাছে এক কপর্দ্দকও নেই।

(অন্য পাওনাদারের প্রবেশ)

পাওনাদার। তিনি সকলকে মজিয়ে গেছেন, একজন দুইজন নয়, এমন দু'শ জনকে।

তারা। ও গো, তোমাদের বেগোরতা করি, বাহিরে থাকনা গো, এখানে কেন? এখানে কি চাও?

(কমলের প্রবেশ)

কমল (ক্রুদ্ধভাবে)। এ কি! এর মানে কি? তোমরা এখানে কেন? দেওয়ানজির কাছে যাবে; এখন চলে যাও।

পাঃ দার। আপনি যদি তাঁর কেউ হন, তবে আপনাকেই তার মীমাংসা করতে হবে, এ-বিষয় বিক্রি করে আমাদের চুকিয়ে দিন।

কমল। কার বিষয় বিক্রি হবে? এ-সম্পত্তি এখন তাঁর নয়, অনেক দিন বিক্রি হয়ে গেছে।

পাঃ দার। কে কিনেছেন?

কমল। তোমরা কেউ কেউ জান বোধ হয়—উকিল কমলবাবু।

পাঃ দার। সেই ছোকরা উকিল?

কমল। হাঁ আমিই সেই; এবং এই জমিদারী আমার। এ থেকে কিছুই তোমরা পেতে পার না, যাও এখন বাহিরে যাও, তাঁর অসহায়া কন্যাকে বিরক্ত কোরো না।

(পাওনাদারগণের প্রস্থান)।

ইন্দিরা। ও! দুঃখের সীমা পরিসীমা নেই! আমি এর কিছুই জানতাম না, কেউ কখন আমায় বলে নি। এখন বুঝছি যে দিন কাটাবার জন্য আমার কোন উপায় নেই। এত দুর্গতি কারো হয়? এমন অবস্থা থেকে?

কমল। রাজকুমারি, আপনি উতলা হবেন না; আমি যথাসম্ভব বন্দোবস্ত কর্‌তে ত্রুটী করবো না। (প্রস্থান)

(বৈঠকখানা—উত্তরাধিকারী দেবনারায়ণ উপস্থিত)

দেব। কি নির্ব্বোধ! এত ধনের অধিপতি হয়েও মেয়েটার জন্য এককড়া কড়িও নেই।

দেওয়ান। এমন কখন শোনা যায় নি। মেয়ের নিজ তহবিলের জন্যেও কখন কিছু তিনি দেন নি, এ দিকে এত খরচ!

দেব। বড় আশ্চর্য্য। বড় অন্যায়। যথেচ্ছাচারী হয়ে পথের ভিখারী হয়ে মলেন।

দেওয়ান। রাজকুমারীর সহায়ও নেই, সম্পত্তিও নেই, আশ্রয়ও নেই, কোথা থাকবেন ঠিক্ নেই।

দেব। মেয়েকে অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করে রেখে গেলেন! কি অবিবেচক! তিন লক্ষ টাকা ঋণ! কি সর্ব্বনাশ! (ঘড়ি দেখে) আমার যাওয়ার সময় হলো, রাজকুমারীকে একবার ডেকে দাও।

(দেওয়ানের প্রস্থান ও রাজকুমারী-সহ প্রবেশ; অপর দিক্ দিয়া কমলের প্রবেশ)

দেব। মা ইন্দিরা, আমি চল্লাম, তোমার কিছু বলবার আছে?

ইন্দিরা। (কমলের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নতমুখে দণ্ডায়মানা)

দেব। তবে তোমার কিছু বলবার নেই আমায়? (মুখের দিকে তাকাইয়াও কি বলছ শুন্‌তে পাচ্ছি না। কিছু বলছ কি?

ইন্দিরা। (গদ্গদ কণ্ঠে) আমি,—আমি—আর কিছু না, আমার কিছু নেই। (বস্ত্রাঞ্চলে মুখাবরণ)

দেব। (অপ্রতিভ হ'য়ে) হাঁ, হাঁ, আমি ভুলে গিছলাম, (পকেটে হাত দিয়া, মণিব্যাগের টাকা গণিয়া পাঁচ টাকা তুলিয়া) এই এখন নাও, আমার আবার পথ খরচ আছে। তবে আসি মা, তুমি মন প্রসন্ন করে তোমার কাকীমার কাছে থেকো। (প্রস্থান)

ইন্দিরা। (কমলের প্রতি চাহিয়া) আমার একটী উপকার কর্ত্তে পারেন?

কমল: কি করবো বলুন, আপনার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রমে প্রস্তুত।

ইন্দিরা। এই দুটী টাকা সেই গরিব সঙ্গীতকার পাবে।

কমল। এত কেন দিচ্ছেন, এই সামান্য টাকা থেকে?

ইন্দিরা। তা হোক্, আমি তার জন্যে আপনার কাছে অবধি অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছি।

ক। আচ্ছা, আর কি কাজ করতে হবে?

ই। (করুণনেত্রে চাহিয়া) আর কিছু না।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। ষ্টেশনে যাবার সমস্ত প্রস্তুত, গাড়ী তৈরী, তারা জিনিষ-পত্র গুছিয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

ইন্দিরা। (কমলকে) সব প্রস্তুত, যাবার সময় হয়েছে, একটী জিনিষ আপনার জন্য এখানেই রইলো। গত সপ্তাহে আমি সোনালী রুপালী মাছ কিনেছিলাম, দুটী ময়দা বা রুটীর গুড়া দিয়ে দিয়ে রাখবেন্।

কমল। একটু বসুন।

ই। না না, আমার এখনি যাওয়াই বিধেয়। (ধীরে গমন ও সঙ্গে সঙ্গে কমলের গমন)

(বহির্দ্বার—গমনোন্মুখী ইন্দিরা, রোরুদ্যমানা দাসদাসী ও বিষণ্ণমুখে কমল দণ্ডায়মান)

ইন্দিরা। (কমলের প্রতি) আপনার সদ্‌-ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞ-হৃদয়ের শত শত ধন্য-বাদ। আপনি আমার জন্য যা' কর্‌লেন এমন কেউ পারে না।

কমল। আবার দেখা হবে।

ইন্দিরা। আপনি ত কাকার সঙ্গে দেখা করবেন, অঙ্গীকার করেছেন, এখন তবে বিদায় —বিদায়। বাবাকে হারিয়ে আজ অনাথিনী হয়ে চল্লুম। (তীব্র রোদন)

কমল। হাঁ, এখনকার মত—এই রকমই—জগদীশ্বর আপনার মস্তকে মঙ্গলাশিস্‌ বর্ষণ করুন্‌। (সকলের প্রস্থান)　　(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী—

"করুণা"।

তব　করুণার অন্ত যে নাই,
　　দুখ দাও সেও তব দয়া
　　　　মৃত্যুও স্নেহরূপে পাই!

বারে বারে বাণে দাগিয়া
জর জর করিলে হিয়া
শেষে প্রেম-রসে প্রাণ রাঙিয়া
　　ফুলে ফুলে দিলে ছাই!

একি　করুণা তব জননি,
　　আজি পায়ে তব সব সঁপিয়া
　　　　জুড়া'ল জীবন অমনি!

আজি　দুঃখ দাও তাও সহিব,
　　সব বোঝা সুখে বহিব,
　　ক্ষতি অপমানে রহিব
　　　　তব প্রেমমুখে চাই॥

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল।

দোলনে।

মন্দার টলমল,
কর সখা একি ছল
অবিরল পরিমল
　　বিতরি'!
জ্যোছনায় চারুহাসি,
বিহসিত মধুমাসী!
এ যে ভালবাসা-বাসি!
　　কি করি!
ঢলে' যাই—টলে' যাই বিহরি'!

পরাণয়ে দিবে দোল
এস সুখ-হিন্দোল
জীবনেরি কলরোল
　　আবরি'!
নীলিম আকাশখানি
অঙ্কে লহ গো টানি,
প্রাণে সুরসাধা বাণী
　　আদরী!
ঢুলে' যাই—ভুলে' যাই! আ মরি!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন দশম-অধ্যায়স্থ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'হে ভগবন্, আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য যে অতিগুহ্য আধ্যাত্মিক উপদেশ দিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইল। এতদিন দ্বৈতভাবে মুগ্ধ হইয়া আমি হন্তা এবং বিপক্ষদল হত হইবে, এই ভাবিয়া যে আমার মোহ হইতেছিল, তাহা তো এখন সকলই ভ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, দ্বৈতভাব তো নাই, সকলই তুমি এবং তোমার আবির্ভাব। হে কমলপত্রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ, আমি তোমার নিকট হইতে ভূতগণের সৃষ্টি- ও প্রলয়-বিষয়ক সকল রহস্য এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য বারংবার শ্রবণ করিলাম। হে পরমেশ্বর, যেরূপ তুমি আপনার বিষয় বলিলে, তাহাতে আমি এখন বেশ বুঝিলাম যে বাস্তবিকই উহা ঐরূপ। এ-বিষয়ে আর আমার কোন সংশয়ই নাই। কিন্তু এক্ষণে আমার মনে আর একটি আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতেছে——আমি তোমাকে আর খণ্ডরূপে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি না; আমি তোমার পরিপূর্ণ বিশ্বরূপ দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছি। যদি আমাকে তাহার উপযুক্ত বিবেচনা কর, তবে একবার ঐ বিশ্বরূপ আমায় দেখাও।" অর্জ্জুন ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া সাধন-পথে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন; যতই তাঁহার জ্ঞান-বৃদ্ধি হইতেছে, ততই তাঁহার অধিকতর জ্ঞান-পিপাসার বৃদ্ধি হইতেছে। তাই তাঁহার এখন একাধারে ভগবানের সমগ্র বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহার নিকট তাহাই ভিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু নিজের সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস নাই, তাই তিনি বলিলেন, 'যদি আমার রূপ দর্শন করিবার উপযুক্ততা থাকে তবে তাহা দেখাও।'

তখন ভগবান্ বলিলেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমার অলৌকিক নানাবিধ নানা বর্ণ-ও আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ দেখ। হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ আমার মধ্যে দেখ। অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বস্তু আমাতে অবলোকন কর। হে গুড়াকেশ! আমার এই শরীরে একত্র স্থিত চরাচর জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা এখনি দেখ; কিন্তু তুমি এই চর্ম্মচক্ষের দ্বারা আমাকে ঐরূপে দেখিতে পাইবে না। অতএব আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞানময় চক্ষু দিতেছি, তুমি আমার অসাধারণ যোগ দেখ।" সাধকের যখন ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান-প্রভাবে সমাধিজ জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হয়, তখন নিজ-দেহমধ্যেই যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত হইতে থাকে। অর্জ্জুন সেই জ্ঞান-নেত্র পাইয়া সকল দেখিতেছেন।"

সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "হে রাজন্, মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন। হরির ঐ রূপ অনেক-মুখ-নেত্র-বিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুত দর্শনবিশিষ্ট, অনেক অলৌকিক-আভরণ-বিশিষ্ট এবং অনেক উদ্যত-দিব্যাস্ত্রবিশিষ্ট; দিব্য-মালা-

ও দিব্য-বস্ত্র-ধারী, দিব্য-গন্ধদ্রব্য-অনুলেপিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময় প্রভাময় অনন্ত ও সর্ব্বত্র মুখ-বিশিষ্ট। আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি এককালে উদিত হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মার প্রভাসদৃশ হইতে পারে।

তখন অর্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানা ভাবে অবস্থিত সমুদয় জগৎ একত্র ব্যবস্থিত অবলোকন করিলেন। অর্থাৎ তখন অর্জ্জুনের 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই মহাজ্ঞানের উদয় হইল। অনন্তর বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত-কলেবর অর্জ্জুন দেবকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "হে দেব! তোমার দেহে সমুদয় দেবগণ, পৃথক পৃথক্ প্রাণিবিশেষ-সকল, দিব্য ঋষিগণ, সমুদয় সর্পগণ ও দেবাদির ঈশ্বর কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে আমি দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, অনেক বাহু উদর বক্ত্র ও নেত্র-বিশিষ্ট এবং অনন্তরূপ তোমাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। কিন্তু তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব-হেতু আমি তোমার আদি মধ্য বা অন্ত কিছুই দেখিতেছি না। অর্জ্জুন এখন ক্রিয়া যোগসিদ্ধ ও সমাধিসিদ্ধ হইয়া কেবল ব্রহ্মরূপমাত্র দেখিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী রূপেই মস্তক, বাহু ও নেত্র প্রভৃতি সকলই সংলগ্ন দেখিতেছেন। তাই কখনও ভীত, কখনও আনন্দে পুলকিত এবং কখনও ভক্তিরসে একেবারে দ্রবীভূত হইতেছেন। অর্জ্জুন বলিলেন, "ভগবন্, আমি এখন আপনাকে মুকুটবান্ গদাবিশিষ্ট, চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জ দুর্নিরীক্ষ্য, প্রচণ্ড অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী এবং অপ্রমেয়-রূপে সর্ব্বত্র দেখিতেছি। তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম, তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি নিত্য ও সনাতন ধর্ম্মের পালক; তুমি চিরন্তন পুরুষ, ইহা আমি জানি। আমি দেখিতেছি যে তুমি উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ, রহিত, অমিত প্রভাব, অনন্তবাহু, চন্দ্রসূর্য্যনেত্র, দীপ্তাগ্নি-মুখ এবং স্বীয় তেজে এই সমস্ত বিশ্বের সন্তাপক। হে মহাত্মন্; স্বর্গ-পৃথিবীর এই অন্তর অর্থাৎ অন্তরীক্ষ এবং সমুদয় দিক্ একমাত্র তোমাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে; তোমার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কররূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত হইতেছে। দেখিতেছি ঐ দেবতার সমূহ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে; কেহ বা ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, মহর্ষি ও সিদ্ধগণ 'স্বস্তি' এই বলিয়া উৎকৃষ্ট স্তব-সমূহে তোমার স্তব করিতেছে। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যে সমস্ত সাধ্যনামক দেবগণ তাহারা বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ, উষ্মপা পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ সমূহ, সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমারে অবলোকন করিতেছে। হে মহাবাহো, তোমার বহু বদন ও নেত্রবিশিষ্ট বহু বাহু ও উরু এবং চরণবিশিষ্ট বহু উদরবিশিষ্ট, বহু দংষ্ট্রা দ্বারা ভয়ঙ্কর মহৎরূপ দেখিয়া সমুদয় লোক ও আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি। হে বিষ্ণো, অন্তরীক্ষ ব্যাপী, তেজোময়, অনেক বর্ণ বিবৃতমুখ ও প্রদীপ্তবিশাল-নেত্র তোমারে দেখিয়া অতিভীতচিত্ত আমি ধৈর্য্য ও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। হে দেবেশ, দন্তদ্বারা ভয়ানক কালাগ্নি তুল্য তোমার মুখসমূহ দেখিয়া আমি দিঙ্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, সুখও পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস তুমি প্রসন্ন হও! ভূপালগণের সহিত ঐ সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সকলেই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ, আমাদের প্রধান যোদ্ধ-

গণের সহিত ধাবিত হইয়া তোমার দংষ্ট্রা-দ্বারা ভয়ানক ভয়ঙ্কর মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে। আবার তাহাদের মধ্যে চূর্ণিত-মস্তক কেহ কেহ দন্ত-সন্ধিতে লগ্ন রহিয়াছে, দৃষ্ট হইতেছে। যেমন নদীসকলের বহু জল-প্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরলোক-বীরগণ সর্ব্বতঃ দেদীপ্যমান তোমার মুখসকলে প্রবেশ করিতেছে। যেমন বেগশালী পতঙ্গগণ মরণের নিমিত্তই প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই-রূপ বেগশালী জনগণও মরণের নিমিত্তই তোমার মুখ-সকলে প্রবেশ করিতেছে। তুমি জলন্ত বদনসকল দ্বারা লোকসকলকে গ্রাস করিয়া বিলক্ষণরূপে ভক্ষণ করিতেছ। হে বিষ্ণো! তোমার উগ্র প্রভাসকল তেজো-দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া দগ্ধ করিতেছে। অতএব উগ্ররূপ তুমি কে, আমায় বল। তোমাকে নমস্কার। হে দেববর, তুমি প্রসন্ন হও; তুমি আদিপুরুষ; তোমাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি; কারণ, কি-জন্য তোমার এরূপ চেষ্টা, তাহা আমি জানি না।"

অর্জ্জুন সাধনবলে সকলই একাকার রূপ দেখিলেন। তাহার মধ্যেই এই পূর্ব্বোলিখিত ব্যাপারসকলও দর্শন করিলেন। তিনি ভয়ে, আনন্দে ও ভক্তিতে এক অদ্ভুত অবস্থায় অনু-ভব করিতে লাগিলেন; তাই বলিয়া উঠিলেন, "ভগবন্, তোমার এ কি রূপ ও এ কি চেষ্টা, তাহা আমায় বুঝাইয়া দিয়া সুস্থ কর। আমি আর ধারণ করিতে পারিতেছি না।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে বলিলেন, "অর্জ্জুন, আমি লোকক্ষয়-কারক অনন্তকাল। লোকসকলকে সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, তুমি না মারিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে, তাহারা কেহই থাকিবে না। এ আমারই লীলা। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, যশ লাভ কর, শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য (অর্থাৎ দেহ-রাজ্য) ভোগ কর। ইহারা সকলেই আমা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, বৃথা চিন্তা করিও না। তুমি এক্ষণে নিমিত্তমাত্র হও। তুমি হন্তাও নহ এবং ইহারাও হত নহে। এ সকল আমার লীলা-বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য-মাত্র। আমাকর্ত্তৃক নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীরগণকে তুমি জয় কর, ভয় করিও না, যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চয়ই পরাভূত করিতে পারিবে। অতএব যুদ্ধ কর অর্থাৎ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে থাক।"

সঞ্জয় বলিলেন, কেশবের এই বাক্য শুনিয়া কম্পমান অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণকে নম-স্কারপূর্ব্বক অতিভীত হইয়া প্রণতিপুরঃসর পুনর্গদ্গদ বচনে কহিলেন, 'হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে জগৎ যে অতিশয় আনন্দ লাভ করে এবং অনুরাগ-বিশিষ্ট হয়, রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন, এই সকলই যুক্তি-যুক্ত। হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর এবং ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা তোমাকে জগৎ কেন না নমস্কার করিবে? যে-হেতু সৎ ও অসৎ এবং এ-দুইয়েরও অতীত ব্রহ্ম তুমিই। হে অনন্তরূপ তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু তুমি অনাদি পুরুষ। তুমিই এই বিশ্বের লয়স্থান এবং জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরমধাম (বিষ্ণুপদ) তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ। তুমি বায়ু

অনল, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক ; প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ, তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় সহস্রবার নমস্কার, আবারও সহস্রবার নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! তোমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার, তোমার সকল দিকেই নমস্কার ; হে অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রম, তুমি সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, অতএব অধিক কি বলিব, তুমি সর্ব্বরূপ। তোমার এ মহিমা এবং বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদবশতঃ অথবা প্রণয়বশতঃ সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইত্যাদি হঠাৎ তিরস্কারভাবে যাহা বলিয়াছি, হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন-কালে, যখন অনুপস্থিত তোমাকে অথবা সাক্ষাৎ উপস্থিত তোমাকে পরিহাসার্থ যে অনাদর করিয়াছি, তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব, তোমার নিকট তাহার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। হে অতুল্য-প্রভাব, তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, অতএব পূজ্য গুরু এবং গুরুর ও গুরু, ত্রিলোকেও তোমার সমান আর কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা অধিক কোথায়? হে দেব অতএব আমি দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া স্তত্য ঈশ্বর তোমারে প্রসন্ন করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের সখা সখার অপরাধ প্রিয়ার্থ সহ্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমার অপরাধ সহ্য কর। হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইতেছি অথচ ভয়ে আমার মন অস্থির হইতেছে। অতএব তোমার সেই রূপ আমাকে দেখাও ; হে দেব, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও। আমি পূর্ব্বে তোমারে যেমন দেখিয়াছি, সেই রূপই কিরিটী, গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে, হে সহস্রবাহো, সেই চতুর্ভুজ-রূপেই আবির্ভূত হও।"

অর্জ্জুন জ্ঞানোদয়ে এক অক্ষয় ও অব্যয় রূপ হইতেই যে সকল উদ্ভূত, তাহা এখন বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় দর্শন করিলেন কিন্তু দৃঢ়তা অভাবে তাহা অধিকক্ষণ ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন এবং সেইজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি সন্দেহচ্ছেদ প্রশ্নও করিতে থাকিলেন। তাই তিনি বলিলেন, "হে ভগবন্! তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপই আমাকে দেখাও, আমি শান্তিলাভ করি।"

তখন ভগবান্ বলিলেন, "হে অর্জ্জুন, আমি তোমার যোগবল-প্রভাবে প্রসন্ন হইয়া আমার এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত ও আদ্য পরমরূপ দেখাইলাম। এই রূপ তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই। হে কুরুবীর, বেশ জানিও যে, না বেদের দ্বারা, না যজ্ঞের দ্বারা, না অধ্যয়নের দ্বারা, না দানের দ্বারা,না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-দ্বারা,না চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যা-দ্বারা, আমার এই রূপ—তুমি ভিন্ন—আর কেহই দেখিতে সমর্থ হয়।" ভগবান্ আত্মরূপে, প্রাণরূপে স্থিরভাব। অর্জ্জুন ক্রিয়াযোগ সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া সেই স্থিরত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ হইয়াই স্বরূপতঃ ভগবৎতত্ত্ব অনুভব করিলেন। তাঁহার মত আর না হইতে পারিলে,কেহই এরূপ দর্শন করিতে পারে না। ভগবান্, বলিলেন "অর্জ্জুন, আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ব্যথা যেন না হয়, বিমূঢ়ভাবও যেন না হয়। ভয়হীন ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় তুমি আমার এই সেই চতুর্ভুজ রূপই দেখ।"

সঞ্জয় কহিলেন, "বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া আবার সেই স্বীয় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন-মূর্ত্তি হইয়া

বিশ্ব-রূপদর্শন-ভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় আশ্বাসিত করিলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ-মূর্ত্তি দেখিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্ন চিত্ত এবং স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম।"

তখন ভগবান্ বলিলেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমার এই যে সুদুর্দ্দর্শ রূপ দেখিলে, দেবগণও সদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। অর্থাৎ দেবতারাও যে-রূপ দেখিতে পান না, সাধক সদ্গুরুর উপদিষ্ট ক্রিয়া-যোগবলে সে সকলই দেখেন।"

মনের চঞ্চলতাতেই দ্বৈত ভাসমান থাকে, একাকার দর্শন হয় না। কিন্তু ক্রিয়াযোগে সিদ্ধ হইলেই চঞ্চলতা দূর হইয়া স্থিরভাব উৎপন্ন হয় এবং তাহাই ব্রহ্মভাব। সেই ভাবে পরিণত হইলে আর বাকী কি থাকে? তখন ব্রহ্মসত্তা-সাগরে মগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া শান্তিময় আনন্দরসেই মজিতে হয়। তাই ঋষিগণ তাঁহাকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন।

ভগবান্ আরও বলিলেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমাকে যেরূপ দেখিলে তাহা না বেদ দ্বারা, না তপস্যা দ্বারা, না দান দ্বারা, না যজ্ঞ-দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। হে পরন্তপ, কেবল-মাত্র আমার প্রতি অনন্যভক্তি-দ্বারা এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং শেষে আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মকারী আমিই যাঁহার পরম পুরুষার্থ, যিনি কেবল আমার উক্ত প্রকারে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্ত, এবং আমাগত চিত্ত হইয়া সর্ব্বভূতে কেবল আমাকেই মাত্র দর্শন করেন, তিনিই কেবল আমাকে প্রাপ্ত হন।" কারণ যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' এই চিরন্তন প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধই আছে।

এইরূপে ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই একাদশ অধ্যায়ে কিরূপে বিশ্বরূপ দর্শন হয়, তাহার বিশদ উপদেশ কহিলেন এবং তাহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। তাই ইহার বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ নাম হইল। এই অবস্থায় সাধকের মায়িক দেহবেষ্টন ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্ষুদ্র আমিত্বের অনন্তে প্রসারিত ও তন্মধ্যে লীন হওন সিদ্ধ হয়। সুতরাং এক অনন্ত রাজ্য সুপ্রকাশিত হয় এবং জীবভাব বিগত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই জীবের শেষ গতি ও মুক্তি। ইহারই জন্য যত কিছু সাধন-ভজন ও যোগ ও তপস্যার অনুষ্ঠান। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত।

রাগ না অভিমান।

"ঠাকুরপো! তোমার কি রকম রাগ বল ত? বাপ্ রে বাপ্! বংশের রাগটা বোল আনায় পেয়েছ দেখ্‌ছি। তুমি মনে কর, তুমি খুবই বাহাদুর, খুব গৌরব এতে। আমার কিন্তু যাই বল, ভাই, এটাকে আমি পনের আনা তিন পাই অন্যায়ের মধ্যে ধরি।"

"আমার অন্যায়টাই বা কি, আর রাগই বা কি শুনি?" "কি অন্যায়! দিন দিন তোমাদের এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমার থাক্‌তে ইচ্ছে হয় না। বল্লেই কেবল বল্‌বে, 'আমার সময় টময় নেই, পরীক্ষায় পড়া; এখন এ'নে কি হ'বে? আর আন্‌বই না।'—কি রকম যে ধরণ

বুঝি না। দেখ, এতটুকু থেকে তোমায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমি কেন বলি, তুমি পর পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই বুঝতে পার্‌বে, কত দুঃখের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে তোমায় এত বড় ক'রে তুলেছি। যত আদর-আব্‌দার, স্নেহ-মমতা, এমন কি হৃদয়ের রক্ত-টুকুও তোমাকে বিলিয়ে দিয়েছি। তোমার সৌভাগ্যে তোমার আনন্দে, আমার সৌভাগ্য-আমার আনন্দ। সেটা তুমি বুঝ্‌তে পার বা না পার, আমি বেশ বুঝি। মা-হারা শিশুর সকরুণ চিৎকার সেটা অন্তর্নাড়ী ও হৃদয়ের গম্ভীর তন্ত্রীকে ব্যথায় টন্‌টনিয়ে দিয়ে যায়, সেই কাকুতি-পূর্ণ স্বর যেন আজও আমার হৃদয়কে পুড়িয়ে ঝল্‌সিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে-দিনের কথা—তুমি ছোট্ট শিশু ছিলে, অফুরন্ত ফুট্‌ফুটে জোছনা-প্লাবিত উঠানে দাঁড়িয়ে আমি আদর করে বল্‌তুম্ 'আয় চাঁদ আয়, আমার তরুর কপালে একটা টিপ্ দিয়ে যা।' তুমিও কচি টপ্‌টপে হাস্য-প্রফুল্ল মুখখানি জোছনায় সঙ্গে মিশিয়ে বল্‌তে, 'কৈ মা, চাঁদ আসে না, ভারী দুষ্টু হয়েছে না?' শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তুমি এত বড়টি হয়েছ, কিন্তু সেই আশৈশব চঞ্চল স্বভাবটি এখনও ত্যাগ করতে পার নি। তুমি ত আমার কথা কখনও অবহেলা কর নি। লক্ষ্মী ভাইটি আমার! আর কেন ও-সব রাগ-রোষ! কুটুমের সঙ্গে বাগ্-বিতণ্ডা করে কি হবে? এ-সব কি আর চিরদিন থাকে? এ-মাসে ঐ শ্যাম-দৈবজ্ঞকে ডেকে একটি ভাল দিন ঠিক্ ক'রে সুরুকে আনা যাক্ না?"

"তোমার কথা ত কখনো অমান্য করি নি, বৌদিদি! একটী বার ছাড়া তোমার অবাধ্য হ'ব না। তোমার পায়ে পড়ি বৌদিদি, এ-সব সম্বন্ধে আমায় আর জোরাজেদি কোরো না। যে ঐশ্বর্য্য-গরিমায় স্ফীত হ'য়ে এমনভাবে বিদ্রূপ উপহাস করতে পারে, তার সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি? বল ত এতে আমার দোষ কি আছে? সেই দিন যখন নাকের জলে চোখের জলে হ'য়ে, অপমানের বোঝা ঘাড়ে ক'রে, মান-অপমান বিসর্জ্জন দিয়ে, সেইদিনকার বৃষ্টি-ঝাপ্টার মধ্যে জীবনখানাকে বিপন্ন করে, সেই পাঁচ ক্রোশের তেপান্তর-মাঠ ভেঙে ফিরে এসেছি, সেদিনটা কি তোমার মনে পড়ে না, বৌদিদি? আমার দুর্দ্দশা দেখে তুমি না সে দিন বলেছিলে, 'এত বড় আস্পর্দ্ধা, এত তেজ সমীন মুখুজ্যে রাখে যে, আমার তরুকে অপমান করে! দেখি, কত দূরের জল কত দূরে মরে! মেয়ে দেবার সময় কতই না খোসামুদি, এখন সাত পাক হ'য়ে গিয়েছে কি-না! এর প্রতিশোধ নিতে যদি না পারি তখন আমার নাম শান্তিই নয়! দেখি সে কতদিন তার মেয়েকে না পাঠিয়ে থাক্‌তে পারে!' কেমন! এখন যে তোমার নাম শান্তিই নয়, তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছ? ধন্যি যা হো'ক্ তোমাদের ঐ মেয়ে-কুলকে! সে-দিনকার সেই অটল প্রতিজ্ঞা, অফুরন্ত অভিমান, সবই এর মধ্যে ভুলে গেলে, বৌদিদি?"

"মনে আছে তরু, সবই। তোর অপমান এখনও আমার প্রাণে ছুঁচের মত বিঁধ্‌ছে! কিন্তু কি কর্‌ব, না আন্‌লে ত আর উপায় নেই! লোকে আমার দোষ দিচ্ছে। যা' ইচ্ছে তাই রটিয়ে বেড়াচ্ছে;—লোকে ত আর ভিতরকার কথা জানে না! তাদের যে কি মাথা ব্যথা পড়েছে তা জানি নে! সে-দিন

ঘাটে-ঘাটে খুকুজোদের বৌয়েদের টিট্‌কিরীতে প্রাণখানা যেন আমার হাঁপিয়ে উঠেছিল। বলে কি না, 'হাঁ। রাইপুরের বৌ, দেওরকে কি আর ঘর-কন্না কর্ত্তে দেবে না? বৌকে অমেন মত বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে? আনুবার নামটি পর্য্যন্ত কর না। লোকে দেখেই বা কি বলবে! তোমার কি আর বৌ নিয়ে ঘর করতে সাধ যায় না? ও-সব ভাল নয় গো। আমাদের উনি সে-দিন কলকাতা থেকে এসেছিলেন, কি একটা ছুটি ছিল। রাইদের মেলা থেকে ও সব কথা শুনে এসে আমায় জিজ্ঞেসা করেছিলেন। আমি ত সবই সত্যি কথা বলে দিয়েছিলাম। তিনি শুনে যে তোমায় কত দোষ দিয়েছিলেন তা' আর কি বলব। দেওরটিকে যেন গৃহহীন করবে দেখছি। যতই হোক, কেউ কি আপন স্ত্রীকে ছেড়ে থাকতে পারে। কোথা দু'জন এখন কত হাসিগল্প করবে, না তুমি যে পথ বন্ধ করে বসে আছ। এটা ভারী অন্যায় তোমার! শেষে দেখবে তোমাকেই সব দোষের ভাগী হ'তে হবে।'"

"তা ত সে ঠিক্ বলেছে, বৌদি! ভাজের অন্যায়টা দেখ ত! বউ নিয়ে দেওরকে ঘর করতে দিচ্ছে না। এ অন্যায় কি আর সহ্য হয়?"

"নাও নাও। অত তামাসা করতে হবে না। জানি ত সব-শেষে আমার ওপর সব দোষ পড়বে। কেমন কাল দেখতে হবে ত! এ যে ঘোর কলি! এ কালে যার ভাল করতে যাই, সেই মন্দ ভেবে বসে থাকে। ওঃ এত কষ্ট কপালে ছিল!—যে-দিন তিনি চলে গেছেন, সেই-দিনই জেনেছি যে কপাল মন্দ। না হলে এমন স্বামী, অমন যার বিদ্যে, হাত টা পাশে দেওয়া, যেমন রূপ তেমনি গুণ—অসময়ে আমায় ফেলে চলে গেলেন। তিনি আজ থাকলে, কত অমন নবীন মুখুজ্জে দুয়োরে এসে ধন্না দিত! কত খাতির একদিন ছিল! এ অভাগীর কপালে কি আর এত সহ্য হয়? কষ্ট করতে এসেছি সংসারে, লোকের বাক্যবাণ শুনবো না? মাগো, এত কষ্টও কপালে ছিল! এখনই বা কি হয়েছে? দেওরের হাতে পড়েছি, হয় ত দু'মুঠো ভাতের কাঙালও শেষে হ'তে হবে। কাশী পাঠিয়ে দিয়ে তুমি সুখে ঘর কন্না কর।" বলতে বলতে বিধবার চোখ-দু'টো কোণে কোণে ভরে উঠলো, অশ্রুরাশি কেঁদে বলল, "তুমি যদি গেলে দয়াময়, তবে আর কেন?—আমাকেও তোমার সাথী কর। কেন রেখে গেছ আমাকে?" তা'র সেই দেবতুল্য স্বামীর স্মৃতিখানি মানস-মুকুরে ভেসে উঠল। চলে গেছেন তিনি স্বপ্নের মতন উধাও হ'য়ে, আর তিনি একা যাননি; নিয়ে গেছেন আর একজনের সুখ-শান্তি, বেশ-ভূষা, রমণীর যা' কিছু গৌরবের বস্তু শাঁখা, সিন্দুর, লাল পেড়ে শাড়ী, কামারের ঘরের লোহা—এয়ো-স্ত্রীর লক্ষণ,—ক্ষুদ্র নগন্য কিন্তু রমণীর নিকট মহৎ, মহামূল্যবান।

আজ সুদীর্ঘ চারিটি বৎসর তাহার স্বামী মৃত। রমণী ভেবেই পায় না, ঈশ্বর কি? ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোথায়! দয়াময় নামে সার্থকতা আছে কি সংসারে? থাকলে বোধ হয় তার এমন হ'ত না। মাতা পিতা ভাই-ভগ্নীর স্নেহ-মমতা সেও উপভোগ করতে পায়নি। পিতৃকুলের সকলকে হারাইয়া

এগার বৎসর বয়সে সে একহাত ঘোমটা দিয়ে এ-বাটিতে ঢুকেছে, আর ত্রিশ বৎসর বয়স হতে না হতে সে আজ কাঙালিনী! ঈশ্বরের দোষ কি! সবই তার কপালের দোষ! অভাগী সে! পিতৃ- ও শ্বশুর-কুলের সকলেই গিয়াছেন। আছে কেবল সংসারে তার একমাত্র দেওর, অমাবস্যার সলতে—তার জীবনের একমাত্র আশা-ভরসার স্থান। কিন্তু তাও বিধাতা তার মনে দেওরের প্রতি কণামাত্র স্নেহ দেন্ নি। কোন গুণে গুণী সে নিজে? আছে কেবল তার রাগ আর অভিমান। শুধু লোকের তুচ্ছ কথার জন্যে তার সেই পুত্র অপেক্ষা প্রিয় দেওর তরুকে কি মনোকষ্ট দিয়েছে সে! ধিক তাকে!

তরু নীরব, রমণীও নীরব। দুইজনেরই মস্তক অবনত; সুতরাং পরস্পরের নেত্রে অশ্রু-কণা কাহারও চক্ষে পড়ে নাই। খানিক পরে আত্ম-সংবরণ করিয়া তরু বলিল, "বৌদিদি! তুমি কি ভাব্‌ছো? আমার উপর রাগ করেছ বোধ হয়। আমার আর কে আছে? তুমি যদি এম্‌নি ভাবে রাগ অভিমান কর্‌বে ত আমি দাঁড়াব কা'র কাছে? জান ত, বৌদিদি, আমি পিতৃ-হীন, মাতৃ-হীন, ভ্রাতৃ-হীন, সহায়-সম্পদ-হীন। তুমি যে অযাচিত অনাবিল করুণার অধিশ্বরী দেবী, তোমার কোল যে চিরশান্তি-ময়। তবে কেন আমায় পায়ে ঠেছ? ঠেল্‌লে, তাতে তোমার দোষ কি? জন্মদুঃখী, মন্দভাগ্য আমি, এ-কপালে আর সুখ কোথায়! তোমার মনে কষ্ট দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে কি? যদি কিছু দিয়েছি ত ক্ষমা কর; আর যদি নাই কর, যাও যেথা ইচ্ছা, দাদার যা কিছু আছে নাও, তোমায় বাধা দেব না। একদিন যে ক্ষমতা-তুমি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে আজ আবার নিজের হাতে তা' কেড়ে নিলে। নাও, দুঃখ কিছু নেই, তবে একটা জিনিষ মনে রেখো—তুমি যেদিন আমাকে কাঁদিয়ে চলে যাবে, সেইদিন তোমার স্নেহের তরুও শুকিয়ে যাবে। আমার আর কি আছে? এখনই যাও আর তোমার সাধের তরুর অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে লুকিয়ে যাক্! মা যখন ছেলেকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, ছেলে মা-ছাড়া হ'য়ে পৃথিবী বক্ষে কেন না কেঁদে বেড়াবে?" বল্‌তে বল্‌তে তার মাথাটা বৌদিদির পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ল।

"ওঠ্ তরু! লক্ষীটি আমার, দাদা আমার, ভাই আমার, সোণার চাঁদ আমার! আর তুই এই জন্য দুঃখিনীকে কষ্ট দিস্‌নে। তোর মুখ চেয়ে যে আমি সব ভুলেছি! ওঠ্, তোর বৌদিদিকে ক্ষমা কর্। আর তোর হৃদয়ের দুঃখময় বেদনাপূর্ণ উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমাকে ঠেলে দিস্‌নে। আয় আবার সেই ক্ষুদ্র তরুটীর মত বুকে আয়। আমি তাঁর শোক হৃদয়ে স্থান দিই নি, দুঃখকে দুঃখ বলে জান্‌তে দিই নি। আমার বুকের শোকাগ্নির চিতা তোর ঐ শান্ত শীতল অশ্রুবারিতে ধুয়ে মুছে যাক্। বড় মনোকষ্ট দিয়েছি তোকে, তার প্রায়শ্চিত্ত কোথায় বলে দে আমাকে। আমি নিষ্ঠুর, পাষাণের মত প্রাণ আমার, আর তোকে আমি কিছু বল্‌ব না"—বলে রমণী সাদরে দেবরের চক্ষুজল মুছে ফেলে তাহার মাথায় হাত বাখি-লেন এবং তার হৃদয়-ভার নামিয়ে দিয়ে আবার বলিলেন, "তরু! তুই আমার ওপর রাগ করেছিলি, না?"

"তোমার ওপর রাগ, বৌদিদি। অতিরিক্ত আদর দাও কিনা, তাই আব্দার করে অত-গুলো আবল্-তাবল্ বকে ফেল্লাম। তা'তে দুঃখ্যু কোরো না তুমি।"

"দুঃখ্যু আর কি, তরু। তোর কথা আমি কথার মধ্যেই ধরিনে। বৌয়ের দোষ দিস্, ঐটিই তোর ভারী অন্যায়। নিতান্ত ছেলে-মানুষ সে, তার দোষ থাক্‌লেও নেই। তার ওপর কি রাগ রোষ কর্‌তে আছে?"

"না, ওর মুখ কিছুতেই দেখ্‌বো না, বৌদিদি!"

"কেন? আর একটি বিয়ে কর্‌বি না কি?"

"আর একটি! একটিতেই অস্থির, আবার দুটো কর্‌লে না জানি কিই ঘট্‌বে। তুমিই ত ও, কল্যাণ ঘটালে!"

"ছিঃ! ওকথা কি বল্‌তে আছে। কচি মেয়ে, এখনও তার গাল টিপ্‌লে দুধ বেরোয়।"

"কচি খুকি! কুলোয় শুয়ে দুধ খাচ্ছে! হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি।" "ওসে কথা আর কেন? আমি কিন্তু বলে রাখ্‌ছি, তরু তুই না আনিস্, আমাকেই বুকে করে তা'কে টেনে নিতে হবে সে যে আমার তরুর বৌ রে!"

"যখন নেবে তখন নেবে, এখন তার কি!"

সেদিনের ব্যাপার এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কাল সাম্বৎসরিক আবর্ত্তনের পথ ছ'টি বার প্রদক্ষিণ করিয়া ফেলিল। পরিবর্ত্তনশীল জগতে এই সুদীর্ঘ ছয়টা বৎসরের মধ্যে যে কত পরিবর্ত্তন হইতে পারে তা' ভাবিয়া শেষ করা যায় না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তরুদের সংসারে একটা পরিবর্ত্তনের প্রলয়, ঝড় বয়ে গিয়েছে। তরুর বৌদিদি সংসারে বীতস্পৃহা হ'য়ে বহুকষ্টে তরুর মায়া কাটিয়ে অনেক বাগ বিত-ণ্ডার পর কাশীবাসী হয়েছেন। তরু বা তরণীপ্রসাদ ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট্‌ হয়ে ঢাকায় চলে গেছে। এখন সে আর তা'র বৌদিদির ক্ষুদ্র 'তরু' নেই। এখন সে ঢাকার সাবডিভিসনের হোমরা চোম্‌রা ডেপুটি। বরাবর তার মনে একটা বড় হ'বার ইচ্ছা ছিল। অবস্থার অনাতিশয্যের জন্য তা'কে তা'র শ্বশুরের কাছে একদিন মাথা হেঁট কর্‌তে হয়েছিল। আর সেই অপমান যাহা তা'কে দিন দিন তিলে তিলে বৃশ্চিকের দাহ-ময় দংশনের ন্যায় জ্বলিয়ে মারছিল। নিজের অবস্থার সে কি আর উন্নতি কর্‌তে পারবে না? সেই অপমানটুকু যে তার কাছে অতি হেয় ও ভয়ানক বলে বোধ হয়েছিল। তাই নাকি সে তার সব উৎসাহ সব শক্তিটুকু সুদূর ভবিষ্যতের উন্নতির জন্যে ঢেলে দিয়েছিল। তার গুণে, তার কর্ম্ম-কুশলতায় উপরওয়ালা মুগ্ধ তার অধীন কর্ম্মচারী সকলে তা'র সৌজন্যে প্রীত। লোকহিতকর কার্য্যে সে যোগদান করিতে সে সর্ব্বদা প্রস্তুত। লোকের মুখে তার সুখ্যাতি ধরে না। এখন তা'কে আর টাকার অভাব ভোগ করিতে হয়না। কিন্তু এত সচ্ছলতার মধ্যেও একটা জীব-নের একটা গুরুতর আশা বহু চেষ্টায় সে মন হইতে দূর করিতে পারে নাই।

জগৎ-গ্রাসিনী চিন্তাদেবীর ধ্যানে সে অবিরত মগ্ন। কাজের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও একখানি মুখ তা'র সম্মুখে নাচে কিন্তু পূর্ব্ব-অপমান স্মরণ করিলেই সেটি বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে নানা-প্রকারের চিন্তা তাহার হৃদয়ের মধ্যে তুফান

বহাইয়া দেয়। দোষ ত তা'র বাবার, তার দোষ কি? যদি তা'র কিছু দোষ হয়, তবে ত নানা গঞ্জনা দিয়ে সকলে তার শাস্তি দিয়েছে। না আর না তাহার জিনিষ সে—কি করছে এখন? অভিমানিনী বেদনা-ক্লিষ্ট মুখে উদাস ভাবে তাহার কথাই ত চিন্তা করছে এখন ত তরুণী উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছে কিন্তু কিছুই যে ভাল লাগে না! সমস্ত দিনের অক্লান্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সে বাসায় ফিরে দেখলে সব শূন্য সব ফাঁকা। সব জিনিষই বিষাদ ও নীরবতায় কালিমাচ্ছন্ন। যে দিকে চাহে সেই দিকেই একজনের অভাব। একটুও শান্তি-স্বস্তি দিনের মধ্যে সে পায় না।

হঠাৎ একদিন একটা কেস্ এ'ল-স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর। স্ত্রী স্বয়ং এজলাসে এসে বল্‌ল, "আমার শাশুড়ী আমাকে আমার স্বামীর অধিকার হ'তে বঞ্চিত করতে চায়। অপরাধ কিছুই নয়; মিথ্যা কতকগুলো অপবাদ দিয়ে স্বামীর দু'মুঠো ভাত হ'তে বঞ্চিত করতে চায় কেন? অনিচ্ছাসত্বেও স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু আমি স্ত্রী হ'য়ে কেমন করে তাঁকে পরিত্যাগ করবো? স্বামী আমাকে গ্রহণ করুন্ বা না করুন্, স্ত্রী হ'য়ে তাঁর সেবা হ'তে কেমন করে বঞ্চিত হ'ব? দেবতা জানি না আমি। প্রত্যক্ষ দেবতা স্বামী। স্বামি-সেবাই স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্ম। আপনি ধর্ম্মাবতার; আপনার স্ত্রীও আছেন। ব'লে দেন, আমি কেন তাঁকে পরিত্যাগ করবো। কিছুই চাহি না—কেবল দিনান্তে একটিবারমাত্র তাঁর দর্শন, আর দু'মুঠো তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্নের অধিকারিণী হ'তে চাই। নারায়ণ ও ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর মধ্যে যাঁ'কে আমি 'স্বামী' 'একমাত্র দেবতা', 'আমার জীবনের চিরসঙ্গী' ব'লেছি সেই হৃদয়পূজ্য দেবতার আশ্রয়, আমার এই দেব-স্বত্ব হ'তে সমস্ত জগৎ বিদ্রোহী হ'লেও আমাকে বঞ্চিত করতে পার্ব্বে না। স্ত্রীর হৃদয় হইতে স্বামীকে ছিনাইয়া লইলে থাকিবে কি? অশ্রু-জল, হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস আর অনন্ত জমাট আঁধারের শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ ম্লান-কালিমামাখা, ঘৃণিত, তুচ্ছ জীবন!"

বলতে বলতে রমণীর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠ্‌লো। দুর্দ্দমনীয় আবেগের বশে, পতি-ভক্তির প্রাচুর্য্যে তা'র লজ্জা সরম একেবারে চ'লে গিয়েছিল। তার প্রত্যেক বাক্য একটা জলন্ত অগ্নিশিখা, অথচ সতীত্ব মহিমামণ্ডিত তেজোপূর্ণ—হৃদয়গ্রাহী। কথা বলিবার কালে তার মমতামাখা মুখখানি যেন স্বর্গ হ'তে আগত কেমন একটা অমিত তেজ ও গর্ব্বে উজ্জ্বল! নদীর স্রোতের মত অনর্গল সে বলে যেতে লাগল। হাকিম তরুণী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে তার হৃদয়ের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস শুনে গেল। রমণীর প্রত্যেক কথাটি যেন তা'র হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিল। এ যে তা'রই জীবনের মত ঘটনা। তা'র পর রমণীর স্বামীর উপর স্ত্রীগ্রহণ করবার আজ্ঞা প্রচারিত ক'রে তরুণী যখন বাসায় ফিরে এল, তখন কি যেন একটা মোহ ও আবেগ তাহাকে গ্রাস করেছে। কোন জিনিষেই শান্তি পায় না সে। সেই দিনই রায়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে, সে এক মাসের ছুটী নিল। কি জানি কেন জন্মভূমি দেখবার জন্যে তা'র প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। তখনি চাকরকে তা'র জিনিষপত্র গুছাতে

হুকুম দিল ও রাত্রি ১২ টার ট্রেনে জন্মভূমির উদ্দেশে ছুটে চল্‌ল। কিন্তু কার কাছে যাবে? স্নেহময়ী বৌদিদি সেখানে নেই। কে তা'কে 'আমার তরু এ'ল, ব'লে' কোলে টেনে নেবে! কা'র কোলে মাথা দিয়ে সে শান্তিতে ঘুমুবে? কে তা'কে আদর ক'রে যত্নে রাখ্‌বে! 'এইটি তুমি ভালবাস, এইটি বেশী করে খাও, ব'লে তা'র কাছে কে বসে থাকবে? কিন্তু কি যেন একটা অজানা টানে সে জন্মভূমিপানে চলেছে।

ভোর পাঁচটার সময় সে গ্রামে নামিল। তখনও তা'র জন্মভূমি যেন সুষুপ্তিমগ্ন। সেই নীরবতা ভগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে দু'একটা কোকিলের কুহু রব ধ্বনিত হইয়া তা'র হৃদয়ের আঁধার চতুর্গুণ বাড়াইতেছিল। সুস্নিগ্ধ বাতাস অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ও ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন ফুলের উপর দিয়া বহিয়া গ্রামখানাকে মাতাইয়া দিতেছিল। গ্রামের ক্ষুদ্র স্রোতোয়াম্বা নদী-স্রোতটি রূপার জলের মত তর্ তর্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক দৃশ্য তার মনের মধ্যে এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করতে লাগল। সে যতই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হ'তেছিল ততই মন যেন কেমন করে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। জনহীন গৃহে কি ক'রে একা ঢুক্‌বে, গ্রামের কাউকে ত জানায়নি। সে দেখ্‌বে ঘরে কেবল জঞ্জালের ছড়াছড়ি, গৃহ ইন্দুরের আবাস-ভূমি হ'য়ে পড়েছে। দরজার কাছে গিয়ে হৃদয়ের স্পন্দন অতিরিক্ত বেড়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তরুণী গিয়ে যা' দেখ্‌লে তা' সে নিজেই কল্পনায় আন্‌তে পারি নি। গৃহখানি তক্‌তকে, যেমন পূর্ব্বে থাক্‌তো, বাহিরের দরজা খোলা; তা'র পর যা' দেখ্‌লে সেটা আর জীবনে দেখ্‌তে পাবে ব'লে আশা করি নি। হাস্যময়ী বৌদিদি দরজায় দাঁড়িয়ে! "এই যে তরু এসেছিস্, আমরা কতই ভাব্‌ছিলাম। আয় একটা নূতন জিনিষ দেখাব।"—ব'লে তা'র হাতখানি ধরে টেনে নিয়ে চল্‌লেন। সেও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর অনুগামী হ'ল।

তারপর তরুকে ঘরের দরজায় আগাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে তরু দেখ্‌ল তা'র পত্নী তার ফোটো কোলে ক'রে অজস্র ধারায় তার ওপর অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছে, আর সেই ফোটোর উপর দিয়ে চোখের জলের রাশ ব'য়ে যাচ্ছে। সে বিস্ময়াপন্ন হ'য়ে তার সম্মুখে দাঁড়াল' আর সেই রোদনক্লিষ্টা ভক্তিমতী ছবি বিনাবাক্যে তা'র হাত দু'খানি বুকের কাছে টেনে নিয়ে কেবল দু'টো কথা-মাত্র বল্‌লে।

"বল, তোমার রাগ না অভিমান। একি স্বপ্ন না সত্য।"

শ্রীহরদাস চট্টোপাধ্যায়।

সোণার হার।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গা বিজয়নগর হইতে চলিয়া গেল। সে-দিন মধুরাও মায়াঙ্কার আশ্রমে গিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। মধুরাও যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে

পারিলেন না। মারাঠা অন্যান্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া মধুরাওয়ের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানের স্মৃতি উভয়েরই মনে জাগরূক ছিল। কেহই দুর্গার কথা কহিতে পারিলেন না, অথচ উভয়েরই হৃদয়ে তাহারই কথা আন্দোলিত হইতেছিল।

দেবরায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অদূরে বহির্ভাগে তাঁহার অশ্বারোহী অনুচরবর্গ অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতৃব্যের পদযুগল বন্দনা করিয়া তিনি যখন গাত্রোত্থান করিলেন তখন তিনি আশা করিতেছিলেন পিতৃব্য তাঁহাকে দুর্গার বিদায়-দৃশ্য বর্ণনা করিতে বলিবেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আহ্‌মদের সহিত তাঁহার যে বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার চিত্তবৃত্তিসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইলেও তিনি যে সে বিষয়ের উল্লেখ করিবেন না তাহা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তখন দুর্গার সম্বন্ধে কি বলিবেন তাহাই সংকল্প করিতেছিলেন। কিন্তু মারাঠার প্রথম প্রশ্নে তিনি চমকিত হইলেন। মধুরাওয়ের বদনে আশঙ্কা ও বিস্ময়ের ভাব প্রকটিত হইল।

মারাঠা বলিলেন "সেদিন সভাগৃহে আমার মনে হইতেছিল, সেই দুর্বৃত্তের বিবাহে আমি কেন যে আপত্তি করিয়াছিলাম তুমি তাহা জান। আমার অনুমান কি সত্য?" দেবরায় মৌন হইয়া রহিলেন দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "কিন্তু তবুও ত' তুমিই সে বিবাহে উদ্যোগী হইয়াছিলে! সে কি আমার সম্মতি আছে জানিয়া! তুমি কি সব জান?" মারাঠার বাক্য শুনিয়া মধুরাওয়ের মুখ হইতে আশঙ্কার ভাব অন্তর্হিত হইল কিন্তু তাঁহার বিস্ময়সূচক দৃষ্টি পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল।

মারাঠা বলিলেন, "ঠিক! দুর্গা তোমাকে এ কথা বলিয়াছে। কিন্তু—।" দেবরায় বলিলেন, "দুর্গার নিকট হইতে আমি শুনি নাই।" দুর্গার নাম শুনিয়া মধুরাও নীরবে একবার উভয়ের বদন অবলোকন করিলেন। দেবরায়ের মানসপটে তঞ্জুরাওয়ের অন্তিম শয্যার চিত্র বার বার ভাসিয়া উঠিতেছিল। হতভাগ্য যুবক! কি অশান্তি তোমার পূত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত তিক্ত করিয়া দিয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যের মেঘাচ্ছাদনের ন্যায় এই এক অশান্তি তোমার মরণযন্ত্রণাকে কিরূপ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল! দেবরায় মৌন রহিয়া সেই কথাই ভাবিতেছিলেন।

মারাঠা বলিলেন, "আমিও তাহাই জানিতাম—যদি সে আমাকেও বলিত!—বৎস, তাহা হইলে তোমার কি ইচ্ছা? নির্ব্বাক্ থাকিও না! যদি এখনও নির্ব্বাক্ থাক, তোমারই সমক্ষে আমার বাক্‌শক্তি চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে।" দেবরায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তাত! আদেশ করুন্!"

মারাঠা দরবিগলিত নেত্রে মধুরাওয়ের করদ্বয় ধারণ করিলেন, বলিলেন, "মধুরাও! বন্ধু! আমার এক অনুরোধ আছে। তোমার পুত্র গিয়াছে, দেব তোমার পুত্র হইবে। আমার কন্যা গিয়াছে, তোমার কন্যা হেমকে আমায় দাও। হেম বিজয়নগরের সম্রাজ্ঞী হইবে। আমি সম্রাট্-পিতৃব্য, তোমার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি।" মারাঠার নয়ন হইতে অবিরলধারে অশ্রুধারা ঝরিয়া দুই বন্ধুর সম্মিলিত হস্ত চতুষ্টয়ের উপর নিপতিত হইতে লাগিল।

তপনতাপে তুষারশিখর গলিত হইলে প্রস্তর-গাত্র বহিয়া পার্ব্বত্য তটিনী ঝর-ঝর-ধারে

করিতে থাকে, পর্ব্বত শত চেষ্টা করিয়াও সে জলধারা রুদ্ধ রাখিতে পারে না। তাহার বিরাট অসাড় দেহের প্রতি শৈলখণ্ড সে ধারার স্পর্শে স্পন্দিত হয়, সেই অবিরাম ঝর ঝর শব্দে পর্ব্বতের প্রতি গুহা প্রতিধ্বনিত হয়, সুপ্ত পর্ব্বতের উপত্যকা জীবন্ত হইয়া উঠে। মায়াপ্পার নেত্রে জল, মধুরাওয়ের নেত্রে ও জল। সন্ন্যাসী ও যোদ্ধা পরস্পরের শীর্ণ হস্ত গ্রহণ করিয়া রোদন করিতেছেন।

সন্ন্যাসী ক্রন্দন করে না, যোদ্ধাও ক্রন্দন করেনা। কাঁদান তাহাদের স্বভাব। মাতা পিতা, পত্নী, পরিজনকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাসী গৃহত্যাগ করিয়া আসে। দণ্ড, কমণ্ডলু, চীর-জটা-বল্কল ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী আত্মীয় স্বজনের চক্ষুতে অশ্রুধারা বহাইয়া দেয়। নিষ্করুণ নির্ব্বিকার চিত্তে যোদ্ধা ধরণীর বক্ষ রক্তস্রোতে প্লাবিত করিয়া দেয়, কাহারও দেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন করে, কাহারও বা অন্তরে বিয়োগ-শোকের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। সন্ন্যাসী বা যোদ্ধার নয়নে অশ্রু প্রাকৃতিক নিয়মের বিপ্লব, ঝড়বাধির মত অদ্ভুত, চির হিম দেশে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় আশ্চর্য্যজনক।

জড়িত কণ্ঠে মধুরাও বলিলেন, "মায়াপ্পা! দেবকে অদেয় আমার কিছুই নাই।" মায়াপ্পা আপনার পিঙ্গল জটাজাল পশ্চাতে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "আজ বিশ্বব্যাপী নিরানন্দের মধ্যে এই টুকুই আনন্দ!

দেবরায় আশ্রমের বহির্ভাগে আসিলেন। অশ্ব সজ্জিত ছিল। শরীররক্ষিপরিবৃত হইয়া তিনি প্রস্থান করিলে পর, দুই বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে বিগ্রহের পূজায় ব্যাপৃত হইলেন।

রাজপথে উপস্থিত হইয়া উভয়ে শুনিলেন, যে হস্তীগুলির পৃষ্ঠে রাজকোষের মণিমুক্তা স্থানান্তরিত হইয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। বিদ্রোহী দেবলের পার্ব্বত্য সেনার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা ধনরত্নের উদ্ধারসাধন করিয়াছে বটে কিন্তু দেবলের সন্ধান তাহার দিতে পারিল না। মায়াপ্পা চেষ্টা করিয়া হাস্য করিলেন এবং পার্শ্বে চাহিয়া মধুরাওকে বলিলেন, "পুরলক্ষীর আগমন নিশ্চিত জানিয়া সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যলক্ষ্মী আবার প্রসন্ন হইয়াছেন।"

হেমের সহিত দেবরায়ের বিবাহ হইল। তাহার পর মায়াপ্পা বিজয়নগর ত্যাগ করিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইলেন। মধুরাও দণ্ডনায়কের পদ আর গ্রহণ করিলেন না। দেবরায় নাগরাওকে দণ্ডনায়কের পদ প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মধুরাও তাহা শুনিয়া বিনায়করাওকে বলিলেন, "ত্র্যম্বকের পুত্র! উপযুক্ত দণ্ডনায়কের জন্য অন্যত্র অন্বেষণের প্রয়োজন ছিল না। তুমি দণ্ডনায়ক হইলেই ভাল হইত। সিঙ্গপ্পার দুর্গাধ্যক্ষ যুদ্ধ জানে না। আমার পদাতিক সেনা আর গঠিত হইবে না।" নাগরাও যখন সংবাদ শুনিলেন, তাঁহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। তিনি বলিলেন, "রাজা! এ পদ দাদার প্রাপ্য ছিল। আজ তিনি নাই, এ পদে কেহ বসিতে পারে না।" দেবরায় হস্তের উপর ললাট ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "তাহা জানি নাগরাও! তম্বুরাও থাকিলে তিনিই এই পদ লইতেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তিনি

প্রাণ দিয়াছেন ইহা একণে তাঁহার লাতার।” নাগরাও বলিলেন, “মহারাজাধিরাজ ! তাহা হইলে দণ্ডনায়কের আসন সাম্রাজ্য হইতে উঠিয়া যাক্।” দেবরায় বিষন্ন কণ্ঠে বলিলেন, “নাগরাও ! যখন তন্নুরাও স্বর্গ হইতে দেখিবেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে যে পদ অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন তাহা তাঁহার ভ্রাতার ইচ্ছায় উঠিয়া গেল, তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না, নাগরাও !” নাগরাও বিচলিত হইলেন দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “আমার একান্ত অনুরোধ তুমি এ পদ গ্রহণ কর। যদি তোমরা একে একে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও আমার জীবন দুর্ব্বহ হইবে।”

নাগরাও স্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, সিন্ধুগুপ্তার ভার গ্রহণ করিবে কে ?” বিনায়ক রাও বলিলেন,মহারাজাধিরাজ সে ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন।”

সাম্রাজ্যে আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। শান্তির সহচর ঐশ্বর্য্য ; দেশে ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া আসিল। রাজধানীর পথে পুষ্পবিভূষিত দেহে হর্ষোৎফুল্ল নাগরিকবৃন্দ ভাবনাহীন চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বহুমূল্য বসন, রত্ন ভূষণ ও নানাবিধ পণ্য-সম্ভার বিপণিশ্রেণীর শোভা পুনরায় বর্দ্ধিত করিল।

ক্রমে চারিটি মহানবমীর উৎসব শেষ হইল। বিজয়নগর বলদৃপ্ত অগণ্য সেনার পদভরে কম্পিত, রাজকোষ ধনমাণিক্যে পূর্ণ, বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা, তাহার একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত অপরিসীম বিশ্রান্তি সুখে নিমগ্ন। কিন্তু বাহমণী রাজ্যে বিশৃঙ্খলা। সে রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ খান্‌খানান্ আহ্‌মদ্। তাঁহারই জন্য বাহমণী-রাজ্য যশোমণ্ডিত। কিন্তু হুসিয়ার খাঁর কূট চক্রান্তে আহ্‌মদ্ ভ্রাতার বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইলেন। বৃদ্ধ সুলতান বুদ্ধিভ্রংশ, আহ্‌মদ্ অসন্তুষ্ট, শাহজাদা হাসান উদাসীন। এ ক্ষেত্রে ফল যেরূপ হয় তাহাই হইল। গৃহ-বিবাদে বাহমণী রাজ্য উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল।

একদিন প্রাসাদে দেবরায় নাগরাওয়ের সহিত এই বিষয়েই কথোপকথন করিতেছিলেন। দেবরায় বলিতেছিলেন, “নাগরাও ! বিনায়করাওকে আমাদের মন্ত্রণার মর্ম্ম জ্ঞাপন করা আবশ্যক। তাঁহাকে জানাইও যে আমাদের ইচ্ছা নয় যে মুসলমান রাজ্যের এই গৃহ-বিবাদে আমরা হস্তক্ষেপ করি ; কিন্তু এই গৃহ-বিবাদের ফলে যদি কেহ আমাদের সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইয়া আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, আমরা সসম্মানে তাঁহাকে আশ্রয় দিব। কেহই আমাদের আমাদের শত্রু নহেন, আর অতিথিকে আশ্রয় দিতে আমরা ধর্ম্মানুসারে বাধ্য।”

নাগরাও উত্তর দান করিবার পূর্ব্বেই দ্বারদেশে সহসা একটি ছায়া পতিত হইল। উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন দ্বার-পথে একজন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর দেহ কুব্জ ও বক্র, মুখ-মণ্ডল ক্ষত বিক্ষত—যেন হিংস্র পশুর নখরাঘাতে জর্জ্জর, চক্ষু অন্তর্হিত ; শূন্য অক্ষিকোটরের অবস্থা দেখিলে অন্তরে ভীতির উদ্রেক হয়। সেরূপ বীভৎস বদন কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীর একটি হস্তে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত ভাণ্ড।

নাগরাও কহিলেন, “সন্ন্যাসী ! আপনি একাকী রাজ-সমীপে আসিয়াছেন, সঙ্গে

প্রহরী আসে নাই কেন?” সন্ন্যাসী দ্বারপথ ত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে আসিলেন, তৎপরে নাগরাওয়ের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, “আসিতে চাহিয়াছিল, নাগরাও! আমি নিষেধ করিয়াছিলাম। এ ভবনের প্রত্যেক প্রস্তর আমার পরিচিত।” বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে নাগরাও বলিলেন, “আপনাকে পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আপনাকে আমি চিনিতে পারিলাম না।

দেবরায়ের নিকট সন্ন্যাসীর আগমনের পক্ষে কোন বাধা ছিল না। তিনি সম্মুখস্থ মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিতেছিলেন, অপরাপর সন্ন্যাসীর ন্যায় ইনিও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, নাগরাওয়ের বাক্যে আগন্তুকের ওষ্ঠে একটি ক্ষীণ হাস্য-রেখা জাগিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল এরূপ বিকৃত, তাঁহার হাস্যের চেষ্টা এত করুণ, মর্ম্মস্পর্শী, যে তাহা দেখিয়া দেবরায় শিহরিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, “তুমি কি করিয়া আমাকে চিনিবে? আমার আকৃতির এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে আমার পিতাও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। নাগরাও! আমি দেবল।” নাগরাও স্তব্ধ, বিস্ময়ে তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। দেবরায় ব্যাকুলভাবে বলিলেন, “দেবল তুমি? ভাই তোমার এ দশা কেন?” দেবল হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, “ভগবানের দেওয়া শাস্তি! শাস্তি নয়, দাদা, এ বিচার!” নাগরাওয়ের বিস্ময় ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল, তাঁহার তরুণ বদনের প্রত্যেক রেখা কঠিন আকার ধারণ করিতেছিল। তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন, “উপযুক্ত বিচারই হইয়াছে! দেবল! যদি আজ তোমার এ শাস্তি না দেখিতাম তাহা হইলে আজ দেশের চিরপ্রথামত তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতাম।”

দেবরায় ভাবিতেছিলেন, ‘ইহা কি স্বপ্ন না বাস্তব!’ না, ইহা স্বপ্ন নহে। উজ্জ্বল দিবালোকে কক্ষ প্লাবিত হইয়া রহিয়াছে। রত্নখচিত কক্ষসজ্জা ও স্বর্ণমণ্ডিত ছাদতল সে আলোকে স্নাত হইয়াছে। কক্ষমধ্যে সন্ন্যাসীর বেশে দেবল দাঁড়াইয়া—তাহার মুখে আলোক আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু সে আলোকে নয়নে প্রতিফলিত হইতেছে না। দেবরায় দেখিলেন যে নাগরাওয়ের কঠোর বাক্যে দেবলের বিকৃত মুখে অব্যক্ত যাতনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। দেবল কাতর কণ্ঠে বলিলেন, “আমি এখন জগতের চক্ষে মৃত, আর আমি বাস্তবিকই মৃত, সে আমি আর নহি। আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।” নাগরাও কহিলেন, “তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক্ষণে তোমাকে ক্ষমা না করা কাপুরুষতা। কিন্তু তোমায় যে ক্ষমা করিবে সে কাপুরুষেরও অধম।” দেবরায় অগ্রসর হইয়া দেবলের হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিলেন। “দেবল! আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছি। নাগরাও! দেবল আমার ভাই।” নাগরাও বলিলেন, “সেইজন্য সম্রাট্ তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন! কিন্তু আমার সূর্য্যের মত তেজস্বী, ভীষ্মের মত উদার ভাই যে”—নাগরাওয়ের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল।

দেবলের মস্তক প্রবল স্মৃতির পেষণে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি অবনত-মস্তকে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “নাগরাও, আজ যদি তরু জীবিত থাকিত, আর আমি

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত কর্ম্ম করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে তাহার সমক্ষে দাঁড়াইতাম, সে আমাকে ক্ষমা করিত, নাগরাও!”

মধুরাও কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে স্খলিতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্রাট্ ও নাগরাওয়ের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার আগমন দেখিতে পান নাই। দেবলের কথা শেষ হইবা-মাত্র তিনি মর্ম্মভেদী কণ্ঠে বলিলেন "আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি, দেবল!”

(ক্রমশঃ)

—০—

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

হরিদ্বার হইতে কন্‌খল তিন মাইল রাস্তা। মায়াপুরের পুল দিয়া সোজা রাস্তায় যাইলেই কন্‌খলে পৌছান যায়। কন্‌খল একটী ক্ষুদ্র গ্রাম কিন্তু হরিদ্বার অপেক্ষা বড়। এখানকার বাজার উত্তম এবং স্থানটী সন্ন্যাসিগণের মঠ দ্বারা পূর্ণ। হরিদ্বারে যাহা কিছু বিক্রয় হয়, তাহা কন্‌খল হইতেই যাইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি হরিদ্বারের যে চমৎকার দৃশ্য তাহা কন্‌খলে নাই। রাজামহারাজদিগের ও শেঠ দিগের এখানে সদাব্রত আছে। সুতরাং ভিক্ষুকের অভাব নাই। হরিদ্বারের ঘাট যেমন পাকা বাঁধান, কন্‌খলেও তাহাই। পাতিয়ালা রাজার হবেলী এবং তারামল শেঠের বাটি দর্শনযোগ্য। লণ্ডোরের রাণীর ঘাটও অতীব সুন্দর। সত্রে মুরলীমোহনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজা রঘুবীরসিংহের বিধবা রাণী তাঁহার স্বামীর স্মরণার্থ এই সত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দক্ষেশ্বরের মন্দিরটী পুরাতন। এই মন্দিরের মালিক লণ্ডোরের রাণী। গোঁসাইগণ পূজাদি করিয়া থাকেন। মন্দিরের দক্ষিণে বীরভদ্র ও ভদ্রকালীর মূর্ত্তি এবং সমক্ষে সতী-কুণ্ড। মন্দিরের উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজ আছে, তাহা বিভূতিতে পরিপূর্ণ যাত্রিগণ মস্তকে বিভূতি ছড়ান এবং কিয়ৎপরিমাণে সঙ্গে করিয়াও লইয়া যান।

হৃষিকেশ—ইহা দেরাছন জেলায় অবস্থিত এবং হরিদ্বার হইতে ১২ মাইল। হরিদ্বার হইতে গরুর গাড়ীতে হৃষিকেশ যাওয়া যায়। গঙ্গার দক্ষিণতটে রামজানকীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সমক্ষে গঙ্গার দিকে একটী কুণ্ড আছে, তাহা কুব্জাবর নামে খ্যাত। ঝরনার জল কুণ্ড দিয়া গঙ্গায় যাইয়া পড়ে। মন্দিরের একটু দূরে বারাহজীর মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মন্দির যে নাই তাহা নহে। এখানকার প্রধান মন্দিরটী ভরতজীকে উৎসর্গীকৃত। ভরতজী চতুর্ভুজ। মন্দিরটী পুরাতন বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রবাদ মূর্ত্তিটি শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা স্থাপিত।

সংসারে বিরক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হৃষি-কেশই প্রধান স্থান। সুতরাং তাঁহাদিগের সাহায্যার্থে কতকগুলি ধর্ম্মাত্মা পুরুষ সদাব্রত খুলিয়াছেন। যাত্রীদিগের জন্য ধর্ম্মশালা আছে। হৃষিকেশের উত্তরদিকে লক্ষ্মণের মন্দির আছে। স্থানটি বড়ই রম্য।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

স্বর্গীয়া কুমারী উষাপ্রভা দত্তের পুণ্য শ্রাদ্ধ-বাসরে

স্নেহের ভগিনী উষা! প্রেমেতে হইয়া ভূষা,
দিব্যধামে করেছ প্রবেশ;
মুখে লয়ে ব্রহ্মনাম, পূর্ণ করে মনস্কাম,
শিরে ধরি তাঁহার আদেশ।
মাঘের সে একাদশ; বাড়ায়ে ব্রহ্মের যশ,
ধন্য হ'লে ভক্তের সন্তান;
যে ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে ক্ষণে, জাগে ভক্ত ঋষিগণে,
করিতে সে ব্রহ্ম যোগ, ধ্যান।
সে শুভ মুহূর্ত্তে তুমি, ত্যজিলে এ মর্ত্তভূমি,
প্রিয়জন বিষাদে মলিন;
শ্মশানে ভস্মের প্রায়, রূপান্তর হয়ে হায়!
পূত দেহ হয়েছে বিলীন।
কিন্তু রে জীবন তব, কি মাধুরী অভিনব,
যে সৌরভ করিয়াছ দান,
ফুটন্ত ফুলের মত, বিকশিত হয়ে কত,
দেখায়েছ কি সুন্দর প্রাণ!
যতনে পিতার গৃহে, আজীবন রুগ্ন দেহে,
যে সাধনা করিলে আপনি;
দেহ-অন্তে এই ক'ব পূর্ণ সে সাধনা তব,
পেয়েছিলে সেই স্পর্শমণি।
যাঁহার পরশ লাগি, হ'লে তুমি অনুরাগী,
জীর্ণ শীর্ণ তনুখানি লয়ে;
জীবনেতে ব্রত ধরে, চলেছিলে লক্ষ্য করে,
রোগ শোক সব শুধে বয়ে!
চির-কুমারীর ব্রত, পালন করেছ যত,
প্রাণে বল পেয়েছ সঞ্চয়;
যৌবনে উদ্দাম স্রোত, করেছিলে ওতপ্রোত,
তাঁর প্রেমে পুরিত অন্তর।
কোন দিন চঞ্চলতা শুনি নাই সে বারতা,
ব্রত হ'তে স্খলিত কখন;
চিরদিন নিষ্ঠাবতী গুরুজনে ভক্তিমতী,
দেবতারে দিয়াছিলে মন।
জ্যেষ্ঠা সহোদরা তাঁর, মুছায়েছ অশ্রুধার,
ভয় হতে দিয়াছ অভয়;
শুনিয়া সে মিষ্টবাণী, জুড়াত সবার প্রাণী,
প্রেমেতু মি হলে মৃত্যুঞ্জয়।

বালক বালিকা যত, তোমার ভকত কত,
তুমি প্রাণে দিয়াছিলে আশা,
সবারে মন্ত্রণা দিয়ে, মঙ্গল পথেতে নিয়ে,
দিয়াছিলে স্নেহ ভালবাসা।
সে স্নেহ মধুর ধারা, করিয়াছ মাতোয়ারা,
শুনেছিলে শিশুদের মুখে;
তোমার প্রাণের প্রাণ, কি যে তিনি প্রাণারাম,
কত মিষ্ট লাগে শোকে দুখে।
অশেষ যন্ত্রণা মাঝে, দেখালে সকল কাজে,
স্থির ধীর সংযত জীবন,
তাই ত সাধনে সিদ্ধ, তোমারে করেনি বিদ্ধ,
পাপরিপু প্রবল যখন।
আজ সে সুন্দর প্রাণ, দেবতারে করে দান,
ধন্য তব হয়েছে হৃদয়;
ভক্ত পিতামাতাসনে, আর কত প্রিয়জনে,
মিলে কর প্রেম বিনিময়।
সেথা জরা মৃত্যু নাই, চিদানন্দ সেই ঠাঁই,
রোগ শোক নাহি কোন জ্বালা;
আত্মার পরম শান্তি, দূরে যায় সব ভ্রান্তি,
দেবতারে দিয়া পুষ্পমালা।
সার্থক জনম তোর, স্নেহের ভগিনী মোর,
তবে দুঃখ করিব কি আর?
তোমার সে পুণ্য-স্মৃতি, জীবনে জাগায় প্রীতি,
সে জীবন নহে ভুলিবার।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ, হয় শুধু ম্রিয়মাণ,
যে গৃহের তুমি অলঙ্কার;
উঠে সেথা দীর্ঘ-শ্বাস, দিবে নাকি এ বিশ্বাস,
প্রেমে বাঁধা আছে ত্রিসংসার।
ভগিনী সবারে বল, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং,
দাও সবে স্নেহ ভালবাসা;
ব্রহ্ম নামে হোক্ রুচি, চিরদিন থাক্ শুচি,
প্রাণে রাখ সুগভীর আশা।
যত দুঃখ কষ্ট হোক্, সহ্য কর রোগ শোক,
পাবে সেই প্রিয় প্রাণারামে;
নিকটে আনন্দ ধাম, পূর্ণ হ'বে মনস্কাম,
যাত্রিদল এসে ব্রহ্ম-ধামে।

শুনালে আশার বাণী, আজি মোরা ধন্য মানি
　　ধন্য তোর জীবন যৌবন;
বিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে, প্রাণে সত্য নাম বয়ে,
　　দিলে সবে বহুমূল্য ধন।

ব্রহ্মমন্ত্রে লয়ে দীক্ষা, পেয়েছিলে জিয়ে শিক্ষা,
　　আজ তাই ভাবি অনুক্ষণ;
আজ আত্ম-পর ভুলি, গাহরে হৃদয় খুলি,
　　প্রেমে হব বিচিত্র ভুবন।

প্রিয়দা, ।

শোকাশ্রু।

কনকাভরণা উষা
　　দাঁড়াইলা আসি অই—
আমাদের রত্ন-ভূষা
　　প্রাণময়ী উষা কই?
কেন গো জাগে না উষা
　　কমল নয়ন খুলি,
কেন গো ডাকে না আর
　　মধুর ঝঙ্কার তুলি।
কেন সে স্বরগ-বীণে
　　গাহেনা বিধুর গীতি,
কেন গো ভরে না ঘরে
　　তার ভক্তি স্নেহ প্রীতি?
অই যে অরুণ-রাগে
　　আলোময়ী বসুন্ধরা,
আমাদেরি ঘরে কেন
　　এমন আঁধার ভরা?
আর জাগিবে না উষা
　　তা' কি কভু সহা যায়?
তার সে সৌরভ নিয়ে
　　আর বহিবে না বা'য়?
উষাহীন নিশা দিন—
　　উহুহু! কেমনে র'ব,
উষা নাই! উষা নাই!
　　ও কথা কেমনে স'ব!
আমাদের দেহে উষা
　　ছিল যে জীবনী রূপে,
বরাভয়, শক্তি, জ্ঞান,
　　সঞ্চারিত চুপে চুপে!
বিধির বিশ্বাসী সুতা
　　ধর্ম্মপ্রাণা সত্যব্রতা,
কুমারী তাপসী সে যে,
　　(শিল্প-চিত্র-কলা-রতা!

সংসারের লক্ষ্মীরূপা
　　স্বরগের রেণু ফুল,
এ নর জগতে হায়,
　　নাহি যে তাহার তুল!
বিষম রোগের জ্বালা,
　　বুক-ফাটা ব্যথারাশি
মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা
　　তবু মুখ-ভরা হাসি!
সে যে এসেছিল শুধু
　　আপনা বিলায়ে দিতে,
কেবলি ঢালিয়া দিত,
　　জানিত না ফিরে নিতে।
সে যে চির আদরিনী
　　তাই বোন সবাকার
"দিদির" নয়ন-তারা
　　হৃদয়ের মণি-হার!
এত যে পাহারা ছিল
　　সচকিত শত আঁখি,
তার মাঝে কেমনে সে
　　দিয়ে গেল হেন ফাঁকি!
কত যে খুঁজিয়া মরি
　　কোথা উষা ঘুম যায়,
দারুণ আতপ-তাপ
　　পাছে লাগে তার গায়;
কনক-ভূষণা উষা
　　উদয় অচলে অই,
আমাদের রত্নভূষা
　　প্রাণাধিকা উষা কই!
পুণ্যময় মাঘ মাস
　　পুণ্যময়ী শুভ্র উষা,
পুণ্যদা অষ্টমী তিথি
　　পতি সুপবিত্র ভূষা,

উষারে লইয়া যার
বাবা মা'র স্নেহ-কোলে
সুরবালাগণ তারে
তুষিছে মধুর বোলে।
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি
অমৃত-বাতাস দিয়া,
জননী অমৃতময়ী
দিতেছেন জুড়াইয়া।

আমাদের উষা আজি
স্বরগের উষারাণী,
আমরা পূজিব প্রাণে
ও পুণ্য-প্রতিমাখানি।
তোমারি গৌরবে উষা!
আমরা গৌরবান্বিত
বিশ্বের শুভ্রতা শুভ
তোমাতে যে সম্মিলিত।

শোকসন্তপ্তা :—শ্রীমা—

তর্পণে।

কোন শুভ লগ্নে স্নান উষার আলোকে,
এসেছিলে সুরবালা মরতের ভিতে
তমোরাশি দূরে করি দিব্য জ্যোতিতে
উজল করিলে সবে বিমল আভাতে!
পুলকে ভরিল গৃহ তব আগমনে,
আলোকিল চারিদিক উষার প্লাবনে।

সাধ্বী ললনা পবিত্রতার পূর্ণ মূরতি,
পরহিতে দেবতারে দিলে দেহ আহুতি!,
ধর্ম্মেরে ব্রত ক'রে সেই ধ্যানে সেই জ্ঞানে,
কেবা কাটায় জীবন অমরার সন্ধানে!
ওগো তব স্নেহ ভালবাসা সহিষ্ণুতা গুণে
বেঁধেছিলে সবারে কি দৃঢ় প্রেম-বন্ধনে?

নাহি ক্ষোভ গেছ তুমি চির শান্তির ধামে,
পিতা মাতা পরিজন কত আছে তব বামে।
হেথা প'ড়ে আছে যারা শোকাকুলিত প্রাণে
ভুলিবে তাদের তুমি পাইয়ে কি প্রিয় জনে?
জীবনে আর ত না হেরিব সেই হাসি,
আর কে বা বলিবে জ্ঞানের বচন রাশি!

লও, দেবি! লও অশ্রুসিক্ত মোদের অঞ্জলি,
কত কথা মনে হয়, শোকে উঠে প্রাণ উথলি।
তব আদর্শ হয় যেন মন্ত্র এ জীবনে,
পালি যেন সেই ব্রত সদা কঠোর সাধনে
রাখ প্রভু! সে আত্মারে চির-শান্তি কল্যাণে
সিঞ্চিত ক'রে তা'রে তব প্রেম-সুধা দানে!

শ্রীমতী মণিকা রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 716. April, 1923.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ। ৭১৬ সংখ্যা।	চৈত্র, ১৩২৯। এপ্রিল, ১৯২৩।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'

দ্বাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশ দ্বারা অবিনাশী অব্যয় ব্রহ্মভাব এবং বিশ্বরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ হইতেই আবির্ভূত বা ব্যক্তভাব, উভয়ই বোধগম্য করিলেন। অর্থাৎ ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানের প্রভাবে এ উভয় রূপই বা অবস্থা অনুভব করিলেন। এখন একটি বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি ভগবৎ সমীপে তাহা নিবেদন করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, হে ভগবান্, দুই প্রকার সাধকবৃন্দ দেখিতেছি, কেহ তোমার অক্ষর অব্যয় ও অনির্দ্দেশ্য ভাব অবলম্বনে তোমার উপাসনা করেন, আবার কেহ কেহ সতত তোমাতে যুক্তচিত্ত হইয়া অথবা 'তুমি আমি'-ভাব পরিমুক্ত হইয়া তোমার সহিত একাত্মা হইয়া তোমায় উপাসনা করেন; ইহাদের মধ্যে কে যুক্ততম ও প্রধান?" অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে সাধকদিগের দ্বিবিধ অবস্থা সূচিত হইয়াছে। এক প্রকার সাধকবৃন্দ ব্রহ্ম বিচার অবলম্বনে তাঁহার উপাসনা করেন;—'তাঁহাকে ছুঁই ছুঁই অথচ ছুঁইতে পারিতেছি না,' তাঁহাদের যেন এই রূপ ভাব। আর কতকগুলি সাধক ক্রিয়াযোগ অবলম্বনে তাঁহাতে মিলিয়া গিয়া অর্থাৎ আত্মহারা হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন বা তন্ময়তা অনুভব করেন। ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, অর্জ্জুন তাহাই জানিতে চাহিতেছেন। সাধক মাত্রেরই এই অবস্থাদ্বয় অনুভূত হয়। অর্থাৎ এক দলের কেবল ভগবৎ-তত্ত্ব জানিবারই বাসনা প্রবল হয়, আবার অন্য অবস্থায় সেই তত্ত্বরসে মগ্ন হইয়া তদুপভোগের বাসনাই প্রবল হয়। এখন উহার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহাই জিজ্ঞাস্য।

ভগবান্ কহিলেন, "অর্জ্জুন! আমাতে মন একাগ্র করিয়া সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার

উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম বা প্রধান যোগী। সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ সম্যগ্‌রূপে সংযত করিয়া অনির্ব্বচনীয় রূপবিহীন সর্ব্বব্যাপী অচিন্ত্য স্থির সুতরাং নিত্য, অবিনাশী কূটস্থের (অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় এক রূপের) উপাসনা করেন, সকল ভূতের হিতকারী তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন্! অব্যক্তে যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সিদ্ধি-প্রাপ্তি-বিষয়ে অধিকতর ক্লেশ হয়। যেহেতু অব্যক্ত বিষয়ক নিষ্ঠা মানুষগণ দুঃখে লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎ-পরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যানপূর্ব্বক উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুদ্বারা ব্যাপ্ত সংসার সমুদ্র হইতে শীঘ্রই, আমাতে সন্নিবেশিত চিত্ত তাঁহাদিগের উদ্ধারকারী হই। অতএব আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি-নিবেশ কর, তাহা হইলে উর্দ্ধ দেশে আমাতেই থাকিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই!"

সুতরাং ভগবদ্‌বাক্যে, বোঝা গেল যে যাঁহারা অক্ষর অব্যয় ব্রহ্মভাব অবলম্বনে তাঁহার পূজা করেন, তাঁহাদের সিদ্ধি বিলম্বে হয়। কারণ এ নিষ্ঠা স্থির রাখা বড় কঠিন। কিন্তু যিনি ক্রিয়াযোগ দ্বারা ভগবদ্‌গত-প্রাণ ও-মন হইয়া তাঁহার পূজা করেন, তাঁহার সিদ্ধি শীঘ্র এবং সুখে সম্পন্ন হয়। "ক্রিয়াযোগে প্রাণকে উর্দ্ধে অর্থাৎ দ্বিদল পদ্মে স্থির রাখিতে পারিলেই" ভগবান্ বলিলেন, "আমার অনন্ত সত্তায় সাধক নিজ সত্তা নিমগ্ন করিয়া আমিময় হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন এবং ক্রমে আমাতেই লীন হইয়া অথবা আমিই হইয়া পরম সিদ্ধিলাভ করেন।" তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, "তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলেই ইহার উর্দ্ধে আমাতেই থাকিবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।" প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দুই বিষয়ের যে পার্থক্য তাহা বুঝিলেই কথিত দ্বিবিধ সাধকের অবস্থা বেশ বোধগম্য হইবে। তাহার পর ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, "যে অবস্থা ক্রিয়াযোগ দ্বারা লাভ করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিলে তুমি সদা তাহারই অনুষ্ঠান কর। কিন্তু যদি তাহাতে আপনাকে অসমর্থ বোধ কর, তবে পশ্চাৎ আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর, নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুন, যদি তুমি আমাতে অর্থাৎ আমার বিশ্বরূপে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে অভ্যাস-যোগ দ্বারা অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ মত আমাকে পাইতে যত্নবান্ হও। আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে আমার কর্ম্মে অর্থাৎ প্রাণ-সংযম কর্ম্মে রত হও। কারণ অহংকার-রহিত হইয়া একমাত্র আমাতে লক্ষ্য রাখিয়া নিষ্কাম ভাবে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যদি ইহাও করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে একমাত্র আমার শরণাপন্ন ও সংযতচিত্ত হইয়া সকল কর্ম্মেরই ফলত্যাগ কর। কারণ, সম্যক জ্ঞান রহিত অভ্যাস হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। আবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিষয়ের ধ্যান শ্রেষ্ঠ। এবং উক্তরূপ ধ্যান হইতে আবার কথিত রূপ কর্ম্ম-ফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই ত্যাগ হইতেই শীঘ্র শান্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র, কৃপালু,

মমত্বহীন, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, মদ্বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য, ও আমাতে মনবুদ্ধি সমর্পণকারী, এরূপ যে আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। সকল বিষয়ে নিঃস্পৃহ শুচি, অনলস, উদাসীন, পক্ষপাতশূন্য, চিন্তা-শূন্য এবং সংকল্প বিকল্প-শূন্য-যিনি আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় পাইয়া দ্বেষ করেন না, ইষ্ট-নাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্খা করেন না, এবং যিনি পুণ্য-পাপ-পরিত্যাগী অর্থাৎ যিনি অহংভাববর্জিত ও মদ্‌ভক্তিমান তিনিই আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে একরূপ, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে বিকার শূন্য, আসক্তি শূন্য, নিন্দায় ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, মৌনি, যাহা কিছুতেই সন্তুষ্ট-বাস-স্থানবিহীন, স্থিরচিত্ত, ঐরূপ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। যাঁহারা উক্তবিধ এই অমৃত-ময় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাশীল মৎপরায়ণ সেই ভক্তগণ আমার অতি প্রিয়।

এই রূপে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিলেন, তাই এই অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ রাখিলেন। ইহাই পরাভক্তি। সাধক ভক্তের যখন এই পরাভক্তি হৃদয়ে উদয় হয়, তখন আর তিনি আপনার পৃথক অস্তিত্ব অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহার আর অহঙ্কার কোথায়? ক্রিয়াযোগে তাঁহার প্রাণ স্থির হওয়াতে মন ব্রহ্মসত্ত্বায় লীন হইয়া যায়। তখন আর তাঁহার আত্মপর, শত্রু মিত্র, সুখ দুঃখ, মান অপমান, প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব কিরূপে হইবে? তিনি তখন মহা সত্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া কেবল ভগবৎ দর্শন, স্পর্শন ও মিলন সুখ অনুভব করিয়া আনন্দময় হন। এ অবস্থা জ্ঞান ও ভক্তির অনির্ব্বচনীয় মিলনের অবস্থা। ইহাই ভগবানের অতি প্রিয়। অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় সাধক আপনি আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। ইহা আর বাক্যে বলিবার নহে। যে সুকৃত ভক্ত সাধকের এই অবস্থা হয়, তিনিই তাহা অনুভব করেন কিন্তু বলিতে পারেন না বলিতে গেলেই অদ্বৈত পদ হইতে নীচে নামিয়া দ্বন্দ্বভাবে পতিত হইতে হয়, এবং অতুল আনন্দের চ্যুতি হয়। তাই সমাধি যোগে জীবাত্মা পরমাত্মায় একীভূত হওয়ায় একাকার অমৃতময় ভাব উদয়ে সাধক বিভোর হইয়া পাগলবৎ হইয়া যান। অর্থাৎ তখন তিনি দেহ ত্যাগ হইয়া পর্য্যন্ত এক অপূর্ব্ব মানুষ হইয়া যান। পৃথিবীর সাধারণ লোকের মধ্যে তাঁহার উপমা নাই।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত।

অকাল বিয়োগ।

কোথায় চলিলে মা আমার?
"মার কোল ভালবাসি,
তাইত ছুটিয়া আসি
ছোট মামি! নিকটে তোমার।"
তুমি যে বলিতে বারবার।

বধূরূপে আসি যবে গৃহে তোমাদের,
সাত বছরের মেয়ে
পবিত্র ফুলের চেয়ে,
বেঁধেছিল স্নেহ-ডোরে দিয়ে শত ফের।
কেমনে কাটিলে আজি সে স্নেহবন্ধন?

এ গৃহের চিরশোভা
সুকুমারী উষাপ্রভা,
কোথা যাও চিরতরে আঁধারি ভবন ?

কেন এ অকালে যাও ত্যজিয়া সংসার ?—
'খুকু'র তনয়গুলি
অস্ফুট কুসুম-কলি,
ভাই-বোন্ ভ্রাতৃজায়া স্নেহের আধার ;
কোন অভিমানে যাও ত্যজিয়া সবারে
তেয়াগিয়ে মর্ত্যভূমি ?
জান নাকি মোর তুমি
আছিলে যে পুত্রী শিষ্যা সখী একাধারে ?

মা বাপের সোহাগের যতনের নিধি
সে বিমল স্নেহ-সুধা
পানে মিটে নাই ক্ষুধা
যাইতে সে স্নেহ-ক্রোড়ে তৃষাতুর হৃদি।

পূত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষা আজীবন
সংসারের মলিনতা
পায় নাই স্থান তথা
সরল বিমল হৃদি প্রীতি-নিকেতন।

চির কুমারীর বেশে সাধিলে সাধনা
শিল্পে চিত্রে সুনিপুণা
গৃহকর্ম্মে বিচক্ষণা
ভগবৎ-প্রীতি বিনা না ছিল কামনা।

আশৈশব ব্যাধিগ্রস্ত ক্ষীণ কলেবর ;
তুমি কি মা দেববালা ?
তুচ্ছ করি রোগ-জ্বালা
হাসি-মাখা মুখ, হৃদি আনন্দ-নির্ঝর।

দেব পিতা দেবী মাতা তাঁদের সন্তান
সুখে দুঃখে সদা ধীর
বিভুপদে মতি স্থির
ধন্যা বসুন্ধরা তোমা ক্রোড়ে দিবে স্থান!

সাধিয়াছি কতবার আসিতে হেথায় ;
"দিদির যে কষ্ট হবে
কেমনে যাইব তবে
মাসি মা! এবারে তুমি ক্ষমিও আমায়।"
দিদির যে কষ্ট কেন ভাবিলেনা আজ ?

তোমা তরে দেহমন
করেছিল সমর্পণ
এবে সে ভুলিয়া রবে লয়ে কোন কাজ ?
কাঞ্চন বিশুদ্ধ হয় স্পর্শি হুতাশন
রোগ শোক তাপ দিয়া
মানবেরে সংশোধিয়া
ক্রোড়েতে তুলিয়া লন পতিত-পাবন।

পাইয়াছ বড় কষ্ট সারাটা জীবন
মুক্ত হয়ে সব ক্লেশে
যাও মা শান্তির দেশে
দিব্যপথে দিব্যরথে করি আরোহণ।

আদরের "নিমু" আছে চেয়ে আশাপথ
একাকী থাকিতে তার
ভাল নাহি লাগে আর
তারে কোলে নিয়ে হোক্ পূর্ণ-মনোরথ।

পুণ্যমাসে পুণ্যদিনে পুণ্যময় ক্ষণে
প্রভাত না হতে রাতি
ভক্তি-সুধাপানে মাতি
নর নারী মাতোয়ারা ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তনে।

বিহগ-সঙ্গীত ছলে বসুন্ধরা গায়
সুমধুর উষাকাল
অরুণ-কিরণ জাল
রঞ্জিয়াছে নভস্থল অপূর্ব্ব শোভায়।

ধীরে ধীরে নামে ওই স্বর্গীয় বিমান
হাতে পারিজাত মালা
স্মিত-মুখী দেববালা
আদরে উষার গলে করিল প্রদান।

মুছাইয়ে সব গ্লানি কর-সম্মার্জ্জনে
ধরিয়া যুগল করে
রথে তুলি স্নেহভরে
সমাদরে লয়ে যায় শান্তি-নিকেতনে।
যাও মাতঃ পুণ্যময়ি! যাও পুণ্যধাম
জগৎ দেখুক চেয়ে
মা-বাপের যোগ্য-মেয়ে
চলিল তাঁদের ক্রোড়ে পূর্ণ মনস্কাম!

ছোট মাসীমা।

আমাদের কনিষ্ঠা ভগ্নী কুমারী উষাপ্রভা।

১২৯৪ সালে ১০ই শ্রাবণ আমাদের কনিষ্ঠা ভগ্নী উষাপ্রভা তাহার শুভ্র পবিত্র জীবনখানি লইয়া ৺পিতৃদেবের এই প্রবাসের সেবিকা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহার সেই পবিত্র জীবন-কাহিনী বিবৃত করা উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ফুটাইয়া তুলা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলাইবে না। ৩৬ বৎসর কাল তাহার সঙ্গে একত্রে বাস করিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব জিনিষ ছিল, তাহা আমরা এত দিনেও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এজন্যই বলিতেছি, তাহার সে অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী প্রকাশ করা এ ক্ষুদ্র শক্তিতে অসম্ভব।

উষা অতি শৈশব হইতেই ভগবানের নিকট পরীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মাত্র ৫।৬ বৎসর সে সুস্থ শরীরে ছিল। যখন তাহার সাত বৎসর বয়স তখন পায়ে কাউর ঘা হয়, কিছুতেই সারে না, অবশেষে দৈবঔষধে সে আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু সেই ঘা সারিল বটে, সঙ্গে সঙ্গে আর এক ব্যারামের সূত্রপাত হইল। সর্দ্দি হয়, তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় না, ভিতর ভিতর বুকে বসিয়া যায়। দিনে কিছু বুঝিতে পারে না, রাত্রিতে ঘুমাইতে কষ্ট পায়। তখন আমাদের মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন। তিনি কত প্রকার টোট্‌কা ও ঔষধ প্রভৃতি প্রদান করিলেন কিছুতেই সে ভাব দূর করিতে পারিলেন না, তবে রোগকে আর বৃদ্ধি পাইতে দেন নাই। অল্প ২।১ দিন হইয়া সারিয়া যাইত। সর্দ্দি বুকে বসিলেই তিনি তাহাকে বেশ করিয়া তৈল প্রভৃতি মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিতেন তাহাতে সে সুস্থ হইত।

কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই উষা যখন মাতৃদেবীর এই স্নেহ-ক্রোড় হইতে বঞ্চিতা হইল, তখন হইতেই তাহার জীবনের মহা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ৭।৮ বৎসরের শিশু অসুস্থ হইলে মার কোল পাইলে, সে তার সকল জ্বালা জুড়ায়; অভাগিনী উষা তাহাও হারাইল!! রোগ ও তাহার জীবন মূর্ত্তি নব নব ভাবে দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই অতি শিশুকাল হ'তে মাকে হারাইয়া ও রোগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া উষা এক অপূর্ব্ব জিনিষ লাভ করিল। "তাহা ভগবানের চরণ হৃদয়ে দৃঢ় রূপে ধরা।" জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষ্য সে যাহা দিয়া গিয়াছে তাহাও আর ভুলিবার নয়।

এই হাঁপানি রোগ তাহার আর জীবনে যাইল না। কিন্তু ইহা সব সময় স্থায়ী হইত না। শীতকালটা প্রায় সমস্তই বিছানায় শয্যাগতা থাকিত, আবার একটু গরমের হাওয়া দিলেই উষা আবার নূতন মানুষ হইয়া জীবনের নূতন নূতন কর্ম্মে ব্রতী হইত। শারীরিক চির অসুস্থতার জন্য শৈশব হইতেই তাহাকে স্কুল ছাড়িতে হয়। ঘরে বসিয়া যে কয়দিন ভাল থাকিত, তাহাতেই সে কি অসাধারণ কাজ করিয়া গিয়াছে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। যাহার অন্তরে ভগবানের অতুল শক্তি লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহাকে কি রোগ দুঃখ শোক বা কোন কষ্টে ঢাকিয়া রাখিতে পারে? সেই ব্রহ্মের তেজ সকল বাধা ঠেলিয়া বাহির হইবেই হইবে। তাই উষার জীবনে যাহা দেখিয়াছি তাহা আর কোথাও দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ! ভগবান তাহাকে আজীবন রোগের আগুনে পোড়াইলেন, কিন্তু সে তাঁর চরণ

কেমন ক'রে বুকে ধরে, স্থির দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। এই ক্ষীণ দেহ লইয়া সর্ব্বোপরি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল কিরূপ ব্যাকুলতার সহিত পাঠ করিত তাহা বলিবার নয়। শুধু পাঠ নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে কি পবিত্র ভাবে সে গড়িয়াছিল! সে পবিত্রতার সৌরভে যাহারা তাহার কাছে আসিয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে। সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সৎসাহস, দৃঢ়সঙ্কল্প, লজ্জাশীলতা, সুখে দুঃখে অসীম ধৈর্য্য প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণে তাঁহার হৃদয়খানি ভূষিত ছিল।

দেখিতে দেখিতে উষা এই রুগ্ন দেহখানি লইয়া পিতার স্নেহক্রোড় হারাইল। চতুর্দ্দিক তাহার ঘন অন্ধকার বোধ হইল। সে তাহার সামান্য একটু আত্মচরিত যাহা লিখিয়াছে তাহাতে লিখিয়াছে "এতদিন যে আশ্রয় অবলম্বন ক'রে সকল বিভীষিকার সহিত যুদ্ধ করেছিলাম ১৯০৭ সালে তৃতীয় মাসের চতুর্থ দিবসে ভীষণ দুর্যোগের দিনে এক আঘাতে সে আশ্রয়চ্যুত হইলাম। চারিদিক অন্ধকারে পূর্ণ, কোথায় যাইব, কে আশ্রয় দিবে, কোন পথ ধরিব, কাহাকে আশ্রয় করিব, এই মহা সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, তখন এক অনির্ব্বচনীয় আশ্বাসবাণী পেলাম—

Cast thy burden upon the Lord
And He shall sustain thee.

ঈশ্বরের উপর সকল ভার অর্পণ কর, তিনি তোমার সকল অভাব মোচন ক'রবেন। উপরি উক্ত বাণী শুনিয়া হৃদয়ে কে ক্ষীণ আশার দীপ জ্বালিয়া দিল। সেই সময় অযাচিতভাবে পিতৃস্নেহে পূর্ণ হৃদয়ে যিনি আসিয়া দেখা দিলেন ও নিরাকারধর্ম্ম, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি কয়ে যুত জানিতাম না।"

উষা একটী একটী আঘাত পাইতেছে ও এক একটি নূতন স্বর্গীয় জিনিষ লাভ করিতেছে। পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতাম না, যে সে এত রোগে ভোগে তবু তার হাস্যমুখ কখন মলিন হয় না কেন? এখন বুঝিতেছি সে হাসি তাহার কিসের? পরলোকগত আত্মাদিগকে সে অনেক সময় সুস্পষ্ট দেখিতে পাইত।

এইরূপ মাতৃহীনা হইয়া নিজের হৃদয়ের সকল অভাব চাপিয়া রাখিয়া সেই ক্ষীণ দেহখানি লইয়া সংসারের সকলের সেবা ও নিজে সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা ও সূচিকার্য্য প্রভৃতির উন্নতি করিতে লাগিল। কাহারও সাহায্য পায় না অথচ কাজগুলি অতি সুন্দর সুসম্পন্ন করিত। ইহার উপর সময়ে সময়ে বামাবোধিনীর সকল ভার ঐ দুর্ব্বল শরীরে বহন করিতে লাগিল। গত বৎসর এমন দিনেও তাহার হাতের হিসাব পত্র বামাবোধিনীর জমা খরচের পাত্র রহিয়াছে দেখিতেছি! কে জানিত এত শীঘ্র তার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে!

তাহার জীবনের সকল কথা এই অল্প সময়ের মধ্যে বলা অসম্ভব, এজন্য তাহার শেষ জীবনের ভগবানের প্রতি তার অটল বিশ্বাসের একটী কথা বলিয়া আজ শেষ করিব।

গত যে মাসে কাল "টাইফয়েড" রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, সে রোগের শান্তি এখানে আর কিছুতেই হইল না দেখিয়া চিকিৎসকগণ বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। কিন্তু সংসারের নানা অসুবিধা! সর্ব্বোপরি এরূপ রোগী লইয়া দূর দেশে অপরিচিত স্থানে কি করিয়া যাইব ভাবিয়া

আমরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। এরূপ যাওয়া অসম্ভব প্রকাশ করিলাম কিন্তু রোগী কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তাহার মনের কি অসাধারণ শক্তি। সে বলিল "সেখানে হয় চল, ভগবান্ আছেন।" আমি বলিলাম "ভগবান আছেন ত জানি কিন্তু তিনি ত বুদ্ধি দিয়াছেন। আমরা যদি না বুঝিয়া কাজ করি তবে তিনি তার জন্য দায়ী কিসের? বলিল "না চল পরে দেখবে।" সে নিজেই ঘাটশীলা অত্যন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ ও সেথায় স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া ঐ স্থান ঠিক করিল।

১৬ই আগষ্ট আমরা ওখান হ'তে রওনা হলাম ; সেই দিনই সেখানে পৌছিলাম। একখানি খোলার চালওয়ালা বাড়ী। সেই রাত্রেই খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঘরের ভিতর জল পড়িতে লাগিল। আমার ত ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল তখন। তাহার প্রতি কতই বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছি ভাবিয়া অনুতপ্ত হইতেছি। আমি বল্লাম, "এখন কি উপায় হবে? তোমার ঐ শরীর, থাকিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই। একটী পরিচিত বন্ধু নাই, ডাক্তার নাই।" নাই বলতে কিছুই নাই। আমাদের অভিভাবক হ'য়ে যিনি গেছলেন তিনিও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এমন অবস্থায় কি রোগী লইয়া বাহির হইতে হয়?" উষাত আমাদের সকলের বিরক্তিতে অস্থির হইয়া পড়িল। কি করিবে, নিরুপায়! সেখানে বেশী বাড়ীঘরও নাই যে আর একখানি বাড়ী দেখিয়া উঠিয়া যাইবে। আশ্চর্য্য? বৈকালে আমাদের যে গোয়ালা দুধ দিত সে আসিয়া বলিল, "মা, আপনাদের ভাল বাড়ী চাই?" আমরা ত আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় বাড়ী? চাই।" তখনি যিনি আমাদের অভিভাবক তিনি লোকের সঙ্গে ছুটিয়া গিয়া বাড়ী দেখিয়া আসিয়া আনন্দে অস্থির।

সুন্দর নূতন বাড়ী খানি চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত, অতি সুন্দর! আমরা এখনি ঐ বাড়ী উঠিয়া যাইব বলিয়া তাহার ২।৩ দিন পরেই সে বাড়ীতে যাওয়া হ'লো। সুন্দর কোঠাবাড়ী সব নূতন আসবাব্‌পত্র আমাদের কিছুর অসুবিধা নাই। পরম আরাম পেলাম। তারপরেই সেই বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে এমন সব বন্ধু একটী করিয়া আসিয়া জুটিতে লাগিলেন ও আমাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন যে আমরা দেখিয়া অবাক্ হইতে লাগিলাম। ডাক্তার একজন যিনি ছিলেন, তিনি ঠিক ডাক্তার না হ'লেও চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। তিনি অযাচিত ভাবে আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। এই বিদেশ তখন আমাদের স্বদেশ অপেক্ষা আরাম ও সুখের স্থান হইল। ভগবান্ অযাচিত ভাবে তাঁর করুণা অজস্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। তখন উষা, আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিল "ভগবান আছেন, একথা কি এখন বিশ্বাস কর?" আমি তখন তার কথার আর কোনই জবাব দিতে পারিলাম না। পরে সে বলিল, "এখন থেকে ভগবানের প্রতি আর অবিশ্বাসী হইও না, তাঁর হাতখানি সর্ব্বদা আমাদের অভাব পূরণের জন্য ব্যস্ত রয়েছে, সুস্পষ্ট দেখিতে পেথ।"

সে আমার বয়সের কত ছোট কিন্তু জ্ঞানে কত উন্নত তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে বুঝিতেই পারা যায়। এইরূপে সে তাহার

সমস্ত জীবন আমাদের শোক দুঃখে কি সান্ত্বনা ও কি বল দিয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

তাহার দেহত্যাগের একমাস পূর্ব্বে আমাদের প্রাণাধিক স্নেহের ধন নির্ম্মলেন্দু যখন অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করে, তখন আমরা অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়ি; ঊষা সেই মুমূর্ষাবস্থায় কি গভীর বিশ্বাসের সহিত আমাকে তিরস্কার করিল। সেই ক্ষীণ কণ্ঠে কি শক্তি! চক্ষে একবিন্দু জল নাই, আমাকে বলিল, "কাঁদিতেছ, কিসের জন্য, নির্ম্মল দেহমুক্ত হইয়া আনন্দলোকে গিয়াছে, ইহার জন্য কান্নার কি প্রয়োজন? তোমরা ওরূপ করিয়া কাঁদিয়া তাহার অনিষ্ট করিও না।" এমন কি তাহার নিকট বসিয়া হা হুতাশ করিবার কোন উপায় ছিল না। এই শোকের আঘাত ভগবানের দান বলিয়া এই দুর্ব্বল শরীরে কিরূপে সহ্য করিল ভাবিয়া পাই না। ক্রমে তাহার জীবন-প্রদীপ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। যতই রোগের তীব্র যাতনা আরম্ভ হইল, ততই ভগবানের চরণ প্রাণপণে জাঁকড়াইয়া তাঁহারই গুণ-গানে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। দিবারাত্র গান শুনিবার জন্য পাগল। আত্মীয় স্বজন যিনিই আসেন, তাঁকেই কাতরে মিনতি 'একটি গান কর না।' ভগবানের নামে সে রোগের তীব্র জ্বালা ভুলিতে লাগিল। যথার্থ ভগবৎ-বিশ্বাসী যিনি তিনিই এই বিশ্বাসিনী কন্যার অবস্থা বুঝিতে পারেন। আমরা সংসার-মোহে অন্ধ, ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝি না।

ক্রমে পুণ্য মাঘ মাস উপস্থিত, সে শুইয়া উৎসবের কথা শুনিত। ১ই মাঘ প্রিয়দাদার প্রার্থনাতে আগ্রহের সহিত সে যোগ দিল। ১০ই মাঘ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বলিল, "আজ আমার শেষ।" সমস্ত রাত্রি শ্বাসের যন্ত্রণাতে আচ্ছন্ন, কিন্তু গান বন্ধ করিবার উপায় নাই, যখনই যন্ত্রণার প্রবলতা, তখনই বলিয়া উঠিতেছে, "জোরে ব্রহ্মনাম কর ও জোরে বাতাস দাও।" সঙ্গে সঙ্গে নিজে জোড় হস্তে কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কম্পিত হস্ত দুখানি তুলিয়া মাথায় ঠেকাইতেছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!! প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এইরূপ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত। আমি ঘড়ি খুলিয়া বসিয়া আছি। ক্রমে ভোর হইয়া আসিল, জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত প্রায়, এমন সময় বলিয়া উঠিল, "উঃ ভীষণ যাতনা! পাষাণ বুঝি ফেটে যায়! আমার কি কঠিন প্রাণ, এখনও বাহির হইল না? মা জননি, কোলে তুলে নে মা!" এই শেষ কথা বলিবার দুই তিন মিনিট পরেই সেই পবিত্র অমরাত্মা দেহ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া মাঘোৎসবের ভক্ত পূজারীদের সহিত ভগবানের অনন্ত শান্তির ক্রোড়ে প্রস্থান করিল।

ঊষা আজ ধন্য তোমার জীবন, আজ মহা-পবিত্র দিনে তোমার পবিত্র জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত করিলে। মহাত্মা পিতৃদেবের মুখ উজ্জ্বল করিলে! চিরদিন রোগে, শোকে, দুঃখে, যাঁর চরণ বুকে ধরে হাসি মুখে দিন কাটিয়েছিলে, আজ বিদেহী হয়ে তারই চরণ বুকে ধরে তোমার চিরবাঞ্ছিত অমর লোকে ভক্ত অমরদের সঙ্গে বসে নামসুধা প্রাণভরে পান কর।

মা বিশ্বজননি, কি দেখালে তুমি? আমাদের অন্ধ চক্ষু কি খুলিবে না। এমন জীবন তুমি আমাদের চক্ষের সম্মুখে এতদিন

রাখিলে, আমরা তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিলাম না। মাগো, সুমতি দাও, তোমার ঐ ভক্তকন্যার প্রদর্শিত পথে লইয়া চল। আমরা এই তীব্র শোকের জ্বালার মধ্যে তোমাকে ভাল ক'রে ধরি। এই আশীর্ব্বাদ তুমি কর। আর তোমার সেই কন্যাকে তোমার স্নেহ-ক্রোড়ে রাখিয়া চিরশান্তি বিধান কর।

আমাদের কনিষ্ঠা ভগিনী ঊষা।

ঊষার আলোকের সহিত জন্ম হওয়ায় পিতাঠাকুর মহাশয় তাহার নাম ঊষাপ্রভা রাখিয়া ছিলেন। সুলক্ষণা এই কন্যার জন্ম-গ্রহণে আমাদের পরিবারের অত্যন্ত আনন্দের উদয় হইয়াছিল। আমাদের এই ভগিনীর জন্মের সহিত আমাদের সংসারের নানাপ্রকার শ্রীবৃদ্ধির জন্য মাতাঠাকুরাণী উহাকে পয়মন্ত মেয়ে বলিতেন। বাল্যকালেই ঊষার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধীর স্বভাব ও নানা সদ্‌গুণের জন্য সে সকলেরই আদরনীয় ছিল। ৬।৭ বৎসরের সময় তাহার প্রথম বিদ্যাভ্যাসের জন্য তাহাকে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বিধির বিধান কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রায় ৯বৎসর বয়সের সময় তাহার টন্‌সিল্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাঁপের লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় এই টন্‌সিল্ অপারেসন করা প্রয়োজন বলেন, নচেৎ পরে হাঁপানি রোগ দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু গলার মধ্যে অপারেসন করা-ইতে মাতাঠাকুরাণী রাজী না হওয়ায় ক্রমে তাহা হাঁপানি রোগে পরিণত হয়। কিন্তু সাধারণ হাঁপানি রোগ হইতে ইহার উপসর্গ সকল ভিন্নরূপ। অসুখের সময় তাহার হাঁপের টান ও যন্ত্রণা এত অধিক হইত যে মনে হইত তখন তাহার দম বন্ধ হইয়া প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। এরূপ কত রাত্রি যায়া রাত পরি-বারস্থ সকলকে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছে, কোন ঔষধেই কোন উপকার হইত না। কিন্তু ২।৩ দিন পরে রোগের প্রকোপ কমিলেই আবার ঊষা সুস্থ শরীরে সকল গৃহকর্ম্ম, পড়া-শুনা সকলই করিত। তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইত না যে দুদিন পূর্ব্বে তাহার সাংঘা-তিক রোগ হইয়াছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় জীবিতাবস্থায়, ঊষার এই রোগের প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের যত প্রকার বিধি আছে ও দৈব ও অলৌকিক সকল প্রকার ব্যবস্থাই বিবিধরূপে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়া-ছিলেন। তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে অনেক স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই এ রোগের স্থায়ী প্রতিকার লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এইরূপ রোগ অসুস্থতার নানাপ্রকার বাধা বিঘ্নের জন্য বিদ্যাশিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্বেও উহাকে বাধ্য হইয়া স্কুলের পড়াশুনা ছাড়িয়া ঘরেই পড়াশুনা করিতে হয়। আমাদের মেজ ভগ্নীর অসুখের সময় সে নিজের অসুস্থ শরীর লইয়াও প্রাণপণে তাহার সেবা করে।

পিতাঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমরা

ঊষার চিকিৎসাবিষয় এক প্রকার হতাশ হইয়া রীতিমত চিকিৎসার বিধি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার কোন প্রকার গুরুতর অসুস্থতায় আমাদের শ্রদ্ধেয় আত্মীয় ও বন্ধু ডাক্তার প্রাণধন বসু মহাশয়ের চিকিৎসায় সে শীঘ্রই রোগমুক্ত হইয়া আবার সুস্থ শরীরে সংসারের সকল কার্য্যেই মনোনিবেশ করিত।

আমি কার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বদাই কলিকাতার বাহিরে থাকায় বড়দিদিই সর্ব্বদাই পিতার ন্যায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনে লইয়া যাইতেন ও রোগে তাহার প্রাণপণ সেবা ও যত্ন আজীবন করিয়া আসিয়াছেন।

এই রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাহার অধ্যয়নানুরাগ ও জ্ঞানলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল। স্বর্গীয় বন্ধু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার এই আগ্রহ দেখিয়া ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে বিশেষ ইচ্ছা জানিয়া প্রতিদিন তাহাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ সকল পড়াইতে আসিতেন। তাহা ব্যতীত বামাবোধিনীর জন্য শ্লোক সংগ্রহ করা, তাহার হিসাব-পত্র রাখা, আবশ্যক হইলে ছাপাখানার প্রুফ্ দেখা ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্ম নারীসমিতির কল্যাণকামনায় পিতাঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য প্রাণপণে আজীবন করিয়া আসিয়াছে। দেখা যাইত সেই অসুস্থ শরীরে একটু উঠিয়া বসিতে পারিলেই ঊষা পুরাতন খবরের কাগজ কাটিয়া বামাবোধিনীর জন্য সেলায়ের প্যাটার্ন কাটিতেছে। অনেক গ্রাহকগণের নিকট আমি শুনিয়াছি যে তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েরা ঐ প্যাটার্ণ হইতে তাহাদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের জামা অতি সহজে প্রস্তুত করিতে সমর্থা হন।

শিল্পে ও কলাবিদ্যার প্রতিও তাহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, সেলাই, বয়ন প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যাশিক্ষার জন্য সে অসুস্থ শরীরেও নানা সমিতিতে যোগ দিত ও বাড়ীর অন্য ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিত। তাহার অঙ্কিত তৈলচিত্র-সকল নানা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে।

পবিত্রতা, সত্যে অনুরাগ, মনের ভিতর ও বাহিরের শুচিতা ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মানুরাগ তাহার জীবনের আদর্শ ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়ের আদর্শে সে জন্মাবধি নিরামিষাহারী এবং সে ঈশ্বরোপাসনা না করিয়া কখন জল গ্রহণ করিত না। ভীষণ রোগশয্যায়ও তাহার এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনে ভগবানের কত প্রকার লীলাই আমরা দেখিতে পাইয়াছি। আমাদের এক নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর পর হঠাৎ তাহার শরীরে সেই মৃত আত্মার আবির্ভাব হয়; তখন ঊষা পেনসিল হাতে লইয়া কাগজে নানা প্রকার অভাবনীয় ঘটনা ও ইহ-পরলোকের কথা লিখিয়া অনেককে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। শেষে মৃত আত্মার সংবাদ জানিবার জন্য কত শোকাতুর পরিবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়া ঊষার নিকট হইতে মৃত আত্মার সংবাদ ও অনেক ভবিষ্যৎবাণী জানিয়া যাইত। পরে লোক-সংখ্যা এত অধিক হইতে লাগিল, যে ঊষার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় ডাক্তারগণ তাহাকে আর আত্মার বিষয় চিন্তা করিতে একেবারে নিষেধ করিয়া দেন।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য, পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার সদানুষ্ঠান, হরিনাভি উৎসবে, বামাবো-

খিনীর জন্মদিনে, তাহার কি অসাধারণ উৎসাহ ও আনন্দ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম! তাহার শরীর সুস্থ থাকিলে সে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনে এত সদ্‌গুণাবলী ও কার্য্যানুরাগ দিয়াও ভগবান কেন যে তাহাকে চিররুগ্না করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। কি জীবন-ব্যাপী রোগের সহিত সংগ্রামই সেই ক্ষুদ্র ক্ষীণ দেহ লইয়া তাহাকে করিতে হইয়াছে, ভাবিলে আমরা মোহিত হই। আজ ভীষণ রোগের আক্রমণে আমরা সকলেই তার জীবনের বিষয়ে হতাশ, কাল সে হাসিমুখে আবার সংসারের সকল কার্য্য করিতেছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের গূঢ় তত্ত্ব আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। তাহার অসুখের কারণ কিছুতেই বুঝা যাইত না। কখন কখন সে একাধিক্রমে ২।৩ বৎসর ভাল ছিল, কখন আবার একাধিক্রমে বৎসরাধিকও ভুগিয়াছে। নিজে রোগযন্ত্রণায় অস্থির, কিন্তু পাড়াপ্রতিবাসী আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহারও অসুখের সংবাদ শুনিলে তাহাকে দেখিবার জন্য ও তাহার সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল। বাড়ীর চাকরদের কোন অসুখ হইলে তাহাদের ঔষধ দেওয়া, পথ্য প্রস্তুত করা ও সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান আগ্রহের সহিত করিত।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নীর হঠাৎ মৃত্যুর সংবাদে সে তাঁহাকে শেষবার দেখিতে গিয়া অত্যন্ত কাতর হয়। গত বর্ষায় প্রথমেই তাহার টাইফয়েড্ হয়। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রাণধন বসু মহাশয়ের চিকিৎসায় সে আরোগ্য হইয়া উঠে কিন্তু পেটের গোলমাল ও যন্ত্রণা কিছুতেই যায় না। তার বিশেষ আগ্রহ বায়ুপরিবর্তন করিলে উপকার পাইবে, সেই আশায় ঘাটশীলার উন্মুক্ত স্থানে, পাহাড়ের ধারে একটী নির্জ্জন বাটীতে সে প্রায় তিন মাসকাল ছিল। প্রথমে সে বেশ উপকার বোধ করিয়াছিল কিন্তু শেষে পুনরায় পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল। তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে অবশেষে কলিকাতায় আনা হইল। শেষ পর্য্যন্ত চিকিৎসায় বিশেষ কোন উপকার হইল না। পুণ্য ১১ই মাঘের উষার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উষার প্রভা চিরদিনের জন্য বিলীন হইল।

এই পুণ্য দিনে যখন আত্মীয় বন্ধু সকলে উৎসবের আনন্দে বিভোর তখন সেই আনন্দের মধ্যেই হাসিমুখে সকল আত্মীয় বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্যই যেন ঐ বিশেষ দিনে সেই পবিত্রদেহা সকলের সম্মুখে অমরধামে চলিয়া গেল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের পরম স্নেহাস্পদ ভাগিনেয় নির্ম্মলেন্দুর মৃত্যু-সংবাদে উষা যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছিল তাহাই তাহার শেষ শয্যা।

৩৬ বৎসর কাল সে এই পৃথিবীতে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সহিত নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিয়া ৺পিতাঠাকুর মহাশয়ের প্রদর্শিত ধর্ম্মপথে ওতপ্রোত-ভাবে চলিয়াছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়ের সেই জীবনের ব্রত।

"ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ যদ্যৎ কর্ম্মপ্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

সে আজীবন পালন করিয়া আসিয়াছে। তাহার পবিত্র আদর্শ-চরিত্রে আমরা কখনও পিতৃনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথ হইতে রেখামাত্রও বিচ্যুত হইতে দেখি নাই।

আমাদের পিতামাতা তাঁহাদের এই চিররুগ্না কন্যার জন্য সর্ব্বদাই যারপরনাই ব্যাকুল থাকিতেন। তাঁহারা সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের সেই কর্ত্তব্যভার আমরা লইয়া, কোন দিনই তাহার রোগ যন্ত্রণার কোন প্রকার প্রতিকার করিতে পারি নাই। রোগ-যন্ত্রণা আপনিই ভোগ করিয়া আবার রোগমুক্ত হইয়া সে আপনিই নিজেরও সকলের তত্ত্বাবধান করিয়াছে। আজ সে তাহার সকল রোগ যন্ত্রণায় হাত হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যধামে সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আমাদের পিতামাতার সহিত মিলিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের সুকন্যাকে পাইয়া পুলকিত হইয়াছেন। আমরা আজ তাহাকে হারাইয়া সকলে হাহাকার করিতেছি, আমাদের এই মাত্র সান্ত্বনা, আমরা আজীবন তাহার রোগ যন্ত্রণায় কোনই লাঘব করিতে পারি নাই ভগবান্ তাহাকে সকল রোগ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া নিজ ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। তাঁর চরণে এই প্রার্থনা, আমাদের সেই স্নেহের ভগিনী তাঁহারই বিশাল পরিবারে শান্তিতে বিশ্রাম করুক্।

যে যে আত্মীয় বন্ধুগণ উহার রোগ যন্ত্রণার সময় তাহার জন্য প্রাণপণ চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী। বড়দাদা

করুণা।

কোন্ অজানা দেশ হ'তে
ভেসে আসে করুণা তোমার
মূঢ় আমি বুঝিতে নারি
কে হে তুমি করুণা-আধার?
তোমার দয়ার জ্যোতি
ভেসে ওঠে সুদূর অম্বরে,
তোমার অভয়-বাণী
ধ্বনি-উঠে পর্ব্বত-কন্দরে!
যখন বিপদে পড়ি
কাঁদি আমি হইয়া কাতর,
তোমার আশ্বাস-বাণী
পশে মোর প্রাণের ভিতর।

জীবের মঙ্গলতরে
আছ তুমি সদা যত্নবান্,
আমরা বুঝিনা তাহা
মিছে শুধু করি অভিমান।
যখন যে দুঃখ পাই
তব নামে দিই কত দোষ,
হাসি মুখে সব সহ
করনা কভুও তুমি রোষ।
যেন গো মোহেতে ভুলে
হই নাক তব পদ হারা
ও-চরণ পাই যেন
হবে যবে সব কাজ সারা!

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

চন্দন।

[রচনা—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ]

হব চন্দন দেব-কাননে ;—
নন্দন-মাঝে গন্ধ ছড়াব
মন্দ মলয়া-বাহনে।
আমারে লইয়া ঘসিয়া—পিষিয়া
ত্রিদিব-কন্যা যতনে ;
কবে সাজি ভরি দিবে সাজাইয়া
তব পূজা উপকরণে ?

কবে কোন্ জন ভাবে নিমগন,
সুন্দর তব চরণে,
মন্দার-ফুল-অঞ্জলি দিবে
মম তনু অনুলেপনে ?
তোমার পরশে পুলক হরষে
জীবন ফুটিবে মরণে ;
নন্দনে পূজা-বন্দনে হব
চন্দন চারু-চরণে॥

[সুর ও স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

গুণকেলী——ঢিমে একতালা।

সমা II { পা -দা দা । পা গমপা গমা I ঋগমপদমা -পমগঋগমা -পমগঋা ।
হব চ ন্ দ ন দে০০ ব০ কা০০০০০ ০০০নে০০ ০০০০

। (সঋগমা -গঋসা গমা) } । সঋগমা -গঋসা া । { সা -ঋা ঋা ।
নে০০০ ০০০ 'হব' নে০০০ ০০০ ০ ন ন্ দ

। গা মগমা মা I পা -মাপা দা । দপা দপা দমপা ।
ন মা০০ ঝে গ ০ন্ ধ ছ০ ড়া০ ব০০

। মা -া পা । দা দা মা I পমপদা দনা -র্সা ।
ম ন্ দ ম ল য়া বা০০০ হ০ ০

। নর্সঋনা -র্সনদপা গমা } II
নে০০০ ০০০০ 'হব'

II { মা দা পা । নর্সা না র্সা I ঋা ঋ র্সা । নর্সা নঋা নর্সা ।
আ মা রে ল০ ই য়া ঘ সি য়া পি০ ষি০ য়া০

০ ১ ২´
। ঋ´ র্সঋ´ র্গর্ম। র্মা -র্গা র্গঋা I নর্সা র্সনা -ঋা।
ত্রি দি০ ব০ ক ০ জ্ঞা০ ন্ত০ ভ০ ০

৩ ০ ১
। র্সঋর্সনা -দপা -মপা। পা ঋ´ নর্সা। র্সা ঋা র্সনর্সা I
নে০০০ ০০ ০০ ক বে সা০ জি ত রি০০

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা নর্সা। দনর্সঋ´ র্সনা দপা। গা মা পা। দপা দা মা I
দি বে সা০ জা০০০ ই০ ষ্ঠা০ ত ব পু জা০ উ প

২´ ৩ ০
I গা -মপা মা। গমপদর্সনা -দপমগঋসা । } । { সা নঋা গমা।
ক ০ ০ র পে০০০০০ ০০০০০০ ০ ক বে০ কো০

১ ২´ ৩ ০ ০
। -া পঋা -পা I দা দনা পা। দা মপা -ঋপা। দা -ননা -দা।
ন্ জ০ ন্ তা বে০ নি ম গ০ ০ন্ সু নুদ ০

১ ২´ ৩ ০
। নর্সা ঋর্গা ঋর্সা I মা -দা পদনর্সঋ´। র্সা -না -র্সা। পা -ঋ-া র্সা।
র০ ত০ ব০ চ ০ র০০০ ণে ০ ০ ম ন্ দা

১ ২´ ৩ ০
। ঋর্স নর্সা নর্সা I দা -া না। পদা মা পঋপা। গা মা ঋা।
র০ কু০ ল০ অ ঞ্জ্ জ লি০ দি বে০০ ম ম ত

১ ২´ ৩
। গা পা মা I গমপা মপা -দা। পদমপা -পমগমা -গঋসা } ।
সু অ সু লে০০ প০ ০ নে০০০ ০০০০ ০০০

০ ১ ২´ ৩
। { সা ঋা গা। মা পা দা I না র্সা দনর্সা। নঋা র্সা র্সনর্সা।
তো মা র প র শে পু ন ক০০ হ০ র যে০০

০ ১ ২´ ৩
। র্সঋর্গা ঋর্গর্মা র্মা। র্গা র্মা ঋা I র্সা দনর্সঋা র্সনর্সা। -া -া -া।
জী০০ ব০০ ন ফু টি বে ম র০০০ ণে০০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। নর্সা র্ঋা র্সা। পদনর্সা নর্সর্ঋা -র্সনা I পা -ঋা না। পর্সনা দপা মগমা।
নন্ দ নে পু৹৹৹ জা৹৹ ৹৹ ব ন্ দ নে৹৹ ই৹ ব৹৹

০ ১ ২´
। পদা মা -পা। গমা ঋগমা পা I দা পনা -র্সর্ঋা।
চন্ দ ০ ন০ চা৹৹ ক্ চ রূ৹৹ রূ০

৩ ৩
। (র্গর্ঋর্সনা -দা -পমগমা) } । র্গর্ঋর্সনদা -পমগমা গমা IIII
শে৹৹৹ ০ ৹৹৹৹ শে৹৹৹৹ ৹৹৹৹ ‘তব’

হিন্দুর তীর্থ নিচয়।

জ্বালামুখী।—পঞ্জাব প্রদেশের কাংড়া জেলায় জ্বালামুখী দেবীর মন্দির অবস্থিত। ইহা বিয়া নদীর উপত্যকার জ্বলনশাল প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। অন্ত প্রবাদ এই যে জলন্ধর দৈত্যের মুখ দিয়া অগ্নিশিখা নির্গত হইত, মহাদেব তাহাকে প্রস্তর চাপা দেন। কিন্তু সেই মুখ-বিনিঃসৃত অগ্নি প্রস্তর ভেদ করিয়া অদ্যাপিও প্রকাশ হইতেছে। মন্দিরটি আধুনিক। ইহার উপরের গম্বুজটি গিল্টি করা, দ্বার রৌপ্য পাত দ্বারা বিমণ্ডিত। শিখ রাজা খড়্গসিংহ এই দ্বারটি উপঢৌকন দেন। সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের যে সকল ভগ্ন অট্টালিকা আছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে বেশ বুঝা যায় এক কালে স্থানটি অতি সমৃদ্ধশালী ছিল।

মন্দিরের মধ্যস্থলে তিন ফিট গভীর একটি গর্ত্ত আছে। এই গর্ত্তটির চারিদিকেই রাস্তা। মধ্যে প্রস্তরটি একটু গর্ত্তকরা। এখানে প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা দিলেই তন্মধ্যস্থিত গ্যাসটি জ্বলিয়া উঠে। এই গ্যাসটি গর্ত্তের দেওয়ালের কতকগুলি রন্ধ্র দিয়া নির্গত হইতেছে। গ্যাসটি অল্পে অল্পে জমা হয়। যখন যাত্রী অধিক হয় তখন মন্দিরের ব্রাহ্মণ ঘৃত প্রদান করিয়া অগ্নিশিখাটিকে রক্ষা করে। মন্দিরটিতে কোন দেবতার বিগ্রহ নাই। যে গর্ত্ত দিয়া অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে তাহাই দেবীর মুখ বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে দেবীর নির্মুণ্ড দেহটি ভজন মন্দিরে আছে। মন্দিরের আয় অত্যন্ত। ভোজক ব্রাহ্মণগণ এই আয়ের অধিকারী। রাঠোর রাজাগণ এককালে এই আয়টি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে প্রত্যেক যাত্রীকে একখানা করিয়া কর দিতে হইত। প্রতি বৎসরই যাত্রী-সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক জমা হয়। মার্চ্চ মাসে যে মেলা হয় তাহাও বড় কম নহে। সন্নিকটে ছয়টি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেগুলি লবণ এবং Iodide of Potassium মিশ্রিত।

জ্বালামুখীতে একটি পুলিশ ষ্টেশন, পোষ্ট-আফিস এবং একটি স্কুল আছে। পাতিয়ালার রাজা একটি পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া-

ছেন। এই পান্থনিবাসটি মন্দিরের সংলগ্ন। এতদ্ব্যতীত আটটি ধর্ম্মশালা আছে।

এখানকার লোকদিগের বিশ্বাস এই যে কার্ত্তিক মাসে সন্তান জন্ম অশুভ। সুতরাং এই সময়ে কোন সন্তান জন্মিলে লোকে 'গোবরসব' নামক ক্রিয়া করে। এই ক্রিয়া দ্বারা দুর্ঘটনা নিবারিত হয় ইহাই লোকদিগের বিশ্বাস। অমাবস্যায় সন্তান জন্মিলে পিতার এবং শুক্লা চতুর্দ্দশীতে জন্মিলে মাতার বিপদ ঘটিয়া থাকে। শেষোক্ত দিনে সন্তান জন্মিলে শিবের প্রতিমা গড়িয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। যমজ পুত্রের পর কোন সন্তান জন্মিলে দোষ নাই কিন্তু কন্যা জন্মিলেই মাতা পিতার পক্ষে বিপদের সূচনা করে। এরূপ কন্যাকে "ত্রেহর" বলে। অষ্টম মাসে অপত্য জন্মিলে অনুরূপ ভয়ের সম্ভাবনা। এই জন্য অষ্টম মাসের প্রসবে একটা চরকা প্রসূতির মস্তকোপরি ঘুরাইয়া দাইকে দেওয়া হয়।

এখনকার লোকেরা বিবাহে স্বজাতীয় নিম্ন শ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ নিম্ন শ্রেণীকে কন্যা দেয় না। বিবাহে যৌতুক দেওয়ার প্রথা আছে সুতরাং টাকার দায়ে অনেকেই অবিবাহিত থাকে। এখনকার বিবাহে চারিটি সর্ত্ত দৃষ্ট হয় (১) পরিবর্ত্ত বিবাহ (২) কন্যার গৃহস্থের জন্ম ভাবী জামাতাকে ৯বা ১০ বৎসর খাটিয়া দিতে হইবে। হয়ত এই খাটুনির পরও কন্যাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করা হয় (৩) অর্থদান (৪) ধর্ম্ম বা পণ। শেষোক্ত বিবাহে অর্থ বা পরিবর্ত্ত কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে একাধিক স্বামী কেহই গ্রহণ করেনা। অর্থ লইয়া পরিণীতা স্ত্রীকে অন্যের নিকট বিক্রয় করা চলে। পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করিতে পারে।

পৌষ, চৈত্র, ভাদ্র এবং আশ্বিন মাসে বিবাহ হয় না। শনিবার এবং বুধবার দক্ষিণে, বৃহস্পতি উত্তরে, রবিবার এবং মঙ্গলবার পূর্ব্বদিকে প্রবাসের পক্ষে প্রশস্ত। শুক্লপক্ষীয় চতুর্থী এবং অষ্টমী বিপদজনক স্থানে কোন লোক কোন কার্য্য করিতে সাহস করে না।

বিধবা ব্যতীত সকল জাতীয়া মহিলাগণ মাংস ভোজন করে। সমতল প্রদেশে ব্রাহ্মণ বা রাজপুত রমনীগণ মাংস ভক্ষণ ভয়ানক পাপ বলিয়া বিবেচনা করে। বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে ভাত এবং মাংস খাওয়ান হয়। শূদ্রগণ মদিরাপান করে। পর্দ্দানসিন রাজপুত মহিলা ব্যতীত সকল রমণীই মেলায় গিয়া থাকে। বিবাহিতা পাহাড়ী মহিলাগণ নথ কখন উন্মুক্ত করে না।

শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী।

ইন্দিরা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(শঙ্করচন্দ্রের উদ্যান-দ্বারে বাসন্তী দণ্ডায়মানা)

বাসন্তী। এই সময় না ইন্দিরার যাবার সময়। ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্ছি কমল তা'কে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছে (দীর্ঘশ্বাস)।

(শঙ্করচন্দ্রের প্রবেশ)

শঙ্কর। বাসন্তী! কমল এসেছিল কি?

বাসন্তী। কই না, বাবা।

শ। তার আফিসেও যায়নি, শুন্‌লাম কোথা গেছে ! (দেখিয়া) ঐযে কমল আসচে।

(কমলের প্রবেশ)

কমল। কেমন আছ, বাসন্তি ?

শঙ্কর। সব ভাল। তুমি নাকি এই জমিদারী নিয়েছ ?

কমল। (সবিনয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

শঙ্কর। শুনচি জমীদার রাজনারায়ণ রায় মেয়ের জন্তে কিছুমাত্র রেখে যান্ নি-না-কি ? এমন কি হবিষ্যির যোগাড়ও ঘরে নেই ! কি আপদ ! এমন মানুষও থাকে ! চারিদিকে লোকে তাঁকে নিন্দে কচ্চে।

কমল। লোকে সবই বলে, লোকে বলে মেয়েটি শোক-চিহ্ন অবধি ধারণ করেনি।

শঙ্কর। হ্যাঁ, আমি এইমাত্র পথে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এলাম, রাজকন্যা জুড়ী করে দাস দাসী মাত্র নিয়ে চলেচে। ভদ্র ঘরের যুবতী কন্যা এমনি করে পথে বেরোয় ? (প্রস্থান)।

কমল। যাকগে ওসব কথা। তারপর, বাসন্তি। (গল্প করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক—২য় গর্ভাঙ্ক।

[দেবনারায়ণ ও তৎ-পত্নী আসীনা]

দেব। ইন্দিরা আমাদের বাড়ী এসে থাকবে।

পত্নী। (আশ্চর্য্যে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে) কে ? ইন্দিরা ? এখানে কেন ?

দেব। আর কোথা যাবে ?

পত্নী। (সশব্দে) এখানে থাকবে ? কক্‌খন তা' হবে না, আমি ত'াকে দুটি চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে, আমি ত'া সইতে পারবো না।

দেব। নইলে আর কোথা যাবে, বল ?

পত্নী। তা যেখানে খুসী যাক্‌গে ; আমি তার কি জানি ?

দেব। বিবেচনা কর, তার আর কোনই আত্মীয় নেই। দূর সম্পর্ক হলেও আমিই তার পিতার উত্তরাধিকারী যখন, দেখ্‌চনা আমিই এখন তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য।

পত্নী। আমি তা পারবো না।

দেব। সে তোমার কোন অপকার করবে না, বড় সুবোধ শান্ত মেয়ে। কত লোক তার সৌজন্তে সুখী !

পত্নী। তা সে—তারে যে করে যে সুখী হবে, সে রাখুক্‌ গে না।

(সক্রোধে প্রস্থান, পশ্চাৎ দেবের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেব নারায়ণের বাটীতে ইন্দিরার কক্ষ। ইন্দিরা, তারা ও দেব নারায়ণের শিশু পুত্র ভুবন বা ভুতু।

ভুবন। (ইন্দিরার হাঁটু ধরিয়া) দোল দোল, কে দোলে ? বাদ্‌ দোলে।

তারা। এইবার আসুন, আপনার চুলটা একবার খুলিয়ে দি', আহা সমস্ত দিন যেন জটা হয়ে থাকে।

(সশব্দে দেবনারায়ণ-পত্নীর-দ্বার খুলিয়া প্রবেশ)

দেব-পত্নী। বলি, সব হচ্চে কি ? হ্যাঁলা ইন্দিরে, তুই আপনার মান আপনি রাখ্‌তে জান্‌লিনি ; এত বেয়াদপি মেয়ের !

ই। (ছলছল চক্ষে) আপনি কি বলচেন, বুঝ্‌তে পাচ্চিনা।

দে-প। বল্‌বো আবার কি ? বাড়ীর মান খোয়ালি, আবাগি, ছি ! ছি ! গোমস্ত ছেলে শচীনকে নিয়ে তিন ঘণ্টা দোর দিয়ে বসে ! সে বাড়ী পা দিতে না দিতে তার সঙ্গে হাসি তামাসা ! এমন বুকের পাটাও ত দেখিনি কখন, বাপরে! পরের ঘরে এত কেন ?

ইন্দিরা। (তাঁহার হাত হ'তে চুল টানিয়া ঘুরিয়া বসিয়া) আমি হাসি তামাসা করি? হাসি তামাসা আমার কখনই নেই; এ বাড়ীর একজনকে মাত্র হাসি তামাসা করতে দেখি, সে কেবল আপনি।

দে-প। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার হ'ল ও এক সম্পর্কে বল্‌তে গেলে মামাত ভাই (ক্রোধে অধীর ভাবে দৌড়িয়া গিয়া ইন্দিরাকে চপেটাঘাতও ইন্দিরার ধূলায় পড়িয়া ক্রন্দন)

তারা। হাঁ হাঁ, কি করেন্ কি করেন্।

(বালকের ভীতভাবে ক্রন্দন)

দে-প। (ভুনুর কাণ ধরিয়া) পাজী বাঁদর, এখান থেকে দূর হ'। (বালককে টানিতে টানিতে নিষ্ক্রামণ) (পট-ক্ষেপন)

[ইন্দিরার কক্ষ। ইন্দিরা আসীন,
ক্রীড়ারত ভুনু]

ইন্দিরা। (স্বগত) আঃ, বাবা, এ পৃথিবীতে যদি আমার স্থান নেই, তবে তুমি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলে না কেন? এস্থানে আর থাকাই নয়, কোথায় বা যাই? এই রকম কষ্টেই মানুষ আত্মঘাতী হয়। কোথাও পালিয়ে যেতে ত পারি না। গিন্নি নিজে শচীনের সঙ্গে সমস্ত দিন হাসি গল্প করেন, আবার পরকে বলেন, 'শচীনকে উনি পেয়ে বসেচেন্।'

ভুনু। দেখ দিদি! মা বেড়াতে গেছেন শচীন বাবুর সঙ্গে, এস তোমাতে আমাতে নীচে যাই; সেখানে আর কেউ নেই।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। (ইন্দিরার প্রতি) একজন ভদ্র লোক আপনাকে খুঁজ্‌চেন্।

ই। আমাকে? না, বোধ হয় গিন্নিমাকে।

ভৃত্য। না, তিনি আপনারই নাম করলেন।

ই। আচ্ছা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

(কমলের প্রবেশ)

এত আশা করি নি, দেখে বড় সুখী হলুম। লক্ষ্মীপুরের খবর কি?

কমল। ভাল। কার্য্যোপলক্ষে এসেছি। মনে আছে, বলেছিলাম আবার দেখা হবে? তাই এখানে এলাম। (বালকের স্কন্ধে হস্ত দিয়া) কি সুন্দর ছেলেটা!

ইন্দিরা। এটী দেব-কাকার ছেলে।

কমল। তোমার বয়স কত খোকা?

ভুনু। ছ'বছর, আমার বোন চার্ বছরের।

ইন্দিরা। (বালকের প্রতি) ইনি কে জান? সেই উকীল বাবু, যিনি আমার প্রতি বড় সদয় ব্যবহার করেন।

ভুনু। তুমি দিদিকে ভালবাস, আমি তোমাকে ভালবাস্‌বো।

কমল। আচ্ছা। ইন্দিরা! তোমার সেই মাছ দু'টী মরে গেছে। ক'দিন বড় ঠাণ্ডা গেছে, তাই বোধ হয়।

ই। এতদিন যে আপনি সে গুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাই যথেষ্ট। আঃ—সে বাড়ীর কথা মনে হলে, আমি যেন কি হ'য়ে যাই।

ক। বোধ করি,এখানে তুমি সুখে আছ?

ইন্দিরা। (মাথা নাড়িয়া) না, কাল সমস্ত রাত্রি ভেবেছি কোথায় যাই,এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।

ভুনু। দিদি বল্‌ছিল, আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। কেন বল্‌ছিল, বলবো? কাল মা রাগ করে দিদিকে মেরেছিলেন—।

ইন্দিরা। চুপ্, ভুনু, চুপ্।

ভুস্থ। —দুই চড় দু গালে দিলেন, দিদি কত কাঁদ্‌লে, আমি কাঁদ্‌লুন, তারা খেলা ঘরে এসে ঝিকে সব বল্লে। দিদি ত অত ভাল মেয়ে, তবু না মার্‌লেন কেন?

ইন্দিরা। ভুস্থ! তুমি খেলা করগে, বাও চাকরের সঙ্গে। (ভুস্থর প্রস্থান) যতক্ষণ না দেব-কাকা আসেন, সব সয়ে থাকি।

কমল। (ম্লান মুখে) তার পর?

ইন্দিরা। তার পর কি করবো জানি না। (চক্ষের জল মুছিয়া) তাঁর ত অন্ত বাড়ী আছে. সেখানে থাকবো; এ গিন্নির কাছে আমি থাকতে পারবো না, তিনি আমার মনে বড় আঘাত দিয়েছেন।

কমল। না, তা পাবে না, দেখচি ত। আমি এর কিছু বিহিত করতে চাই, কি করি বলত?

ইন্দিরা। আপনি আর এর কি করবেন, আর কেই বা কি করতে পারে?

কমল। কিছু করতেই হচ্চে; আচ্ছা। লক্ষ্মীপুরে তোমাদের পূর্ব্বের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পার? না সে স্থানের বড় দুঃখ কর দৃশ্য হয়েছে, তোমার আর তেমন ভাল লাগবে না, না—? তবু পৈতৃক বাড়ী ছিল।

ইন্দিরা। সে পারতুম, যদি বাবা থাকতেন।

কমল। আচ্ছা, যদি এখন আবার সে বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হয়ে যেতে পার।

ইন্দিরা। সে কি রকম?

কমল। আমার ধর্ম্ম-পত্নী রূপে।

(সহসা দেবনারায়ণপত্নীর প্রবেশ)

ই। কাকী মা! ইনি সেই উকিল বাবু।

কমল। আমি দেবনারায়ণ বাহাদুরের কাছে এসেছিলাম; এসে শুনচি তিনি বাড়ী নাই। (প্রণাম করণ) ইন্দিরাকে সম্প্রতি আমি একটি প্রস্তাব কচ্চি।

দেব-প। তাইত দেখ্‌চি, তোমাদের বড় ঘনিষ্ঠতার মতই দেখাচ্ছে। তা বেশ, ওর তা হ'লে বড় সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। এর চেয়ে ওর আর কি ভাল হবে, এ দুর্দ্দশায়। (প্রস্থান।)

২য় অঙ্ক—৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

(দেবনারায়ণের বাটীর কক্ষ)

ইন্দিরা কর্ম্মে নিযুক্ত। শচীনের প্রবেশ)

শচীন। আজ একটা তোমার সুখের খবর শুনলাম, তা বেশ, কমল বেশ ছোকরা।

ইন্দিরা। বাস্তবিক এ আনন্দে তোমার সহানুভূতি? তবে ভাল। (দীর্ঘশ্বাস)

শচীন। হ্যাঁ এতে আমার হৃদয়ের আনন্দ; জেনো উপযুক্ত লোকই উপস্থিত। আমরা গরিব লোক, পরিবার পালন করতে নারাজ। কেবল আমোদ আহ্লাদ করে বেড়াতে চাই, আর কিছুর ধার ধারি না। (প্রস্থান)

ইন্দিরা। গোড়া থেকেই দেখ্‌চি, হৃদয়বিহীন, প্রবঞ্চক! এই মানুষকে মন প্রাণ সমর্পণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলাম! আমি কি নির্ব্বোধ! (কমলের প্রবেশ) (স্বগত) এইত প্রকৃত হৃদয়বান্ লোক; প্রতারণা কাকে বলে জানেন্ না।

কমল। (সহাস্যে) আমার কালকের প্রার্থনা মঞ্জুর হল?

ইন্দিরা। অবশ্য। কিন্তু একটা কথা।

কমল। কি? বল।

ই। যদিও আপনার প্রস্তাবে সম্মত, তবুও ত আপনাকে ওভাবে এখনো দেখচি না।

কমল। এত দিন ও ভাবে দেখনি, এখন দেখবে।

ইন্দিরা। (নত মস্তকে) তা'ত দেখবোই।
ক। (ইন্দিরার হাত ধরিয়া) আর কিছু না, এইটেই আমি চাই; তোমাকে আমার ক'রে এ স্থান হতে মুক্ত করে নিয়ে যাই চল। (ক্রমশঃ)

চৈতন্যের দান।

নদীয়ার নদেচাঁদ কত কাল পরে আজ
উদাসী সন্ন্যাসী-বেশে উদিলা নদীয়া মাঝ!
এই সেই জন্মভূমি
শৈশবের ক্রীড়াগার,
কৈশোরে নিমাই যেথা
দিগ্বিজয়ী ছনিবার!
যৌবনে আপনাহারা বয় শুধু আঁখিধারা,
নিমেষে ভাসিয়া গেল
বিশাল সংসারখানি,
মা'র ও প্রিয়ার বুকে
জলন্ত অশনি হানি'।
নদীয়ার নদেচাঁদ কত কাল পরে আজ
উদাসী সন্ন্যাসী-বেশে উদিলা নদীয়া মাঝ!
কত ভাবে কত স্মৃতি চারি ধারে উথলিছে!
গোরার হৃদয় বুঝি তালে তালে নাচিতেছে!
নিমাই পণ্ডিতে যারা
হেরিয়াছে হেলভরে,
প্রেমিক গৌরাঙ্গে যারা
ফিরেছে বিদ্রূপ করে,
আজি তারা দলে দলে নাচে ওই 'হরি' বলে
চৈতন্যে দেখিতে এসে
অচৈতন্য হয়ে গেছে!
প্রেমের বিজুলী বেগে
কুল-মান হারিয়েছে!
কত ভাবে কত স্মৃতি চারি ধারে উথলিছে!
গোরার হৃদয় বুঝি তালে তালে নাচিতেছে!
সারাটী নদীয়া আজি প্রেম ভরে টল্‌মল্!

'কে হেরিবে নদেচাঁদে, চল্ ভাই, চল্ চল্!'—
ঘরে ঘরে এই বাণী,
ধেয়ে আসে নারী নর,
ক্ষণে ক্ষণে হরি নামে
কেঁপে উঠে চরাচর!
মধুর গোকুল-লীলা স্মৃতির স্বপনে ছিলা,
কে তাহারে জাগাইলা
বুঝি আজ আর বার,
পরশ-রতনে ছুঁয়ে
সোণা হ'ল চারিধার!
সারাটী নদীয়া আজি প্রেম ভরে টল্‌মল্!
কে হেরিবে নদে চাঁদে, চল্ ভাই, চল্ চল্!
থমকি দাঁড়াল গোরা—ওই সেই গৃহখানি,
যেথা সদা বধূ সাথে অশ্রুস্নাতা শচীরাণী!
জননী আসিলা ছুটি
পাগলিনী সমা হায়,—
"কইরে বাছনি মোর!
আয় মোর বুকে আয়!"
সরিল না ভাষা আর, আশাতীত এ যে মা'র,
মূরছি পড়িলা ভূমে
নিমায়ের কাছে এসে,
নিমাই চরণে মা'র
লুটাইলা ভাবাবেশে!
থমকি দাঁড়াল সবে একি দৃশ্য হরি! হরি!
মায়ে ছেলে ধূলি পরে দেন হায়, গড়াগড়ি!
বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবে মনে এত লোক আসিয়াছে,
কেমনে যাইব আমি প্রাণের ঠাকুর কাছে!

আজি যদি নাহি হেরি
হেরিব না তাঁরে আর,
ধরিব জীবন কিসে
অভাগিনী অবলার!
ঘুচে গেল লাজ-ভয়, "এসো তুমি প্রেমময়!"
কাতরে কহিয়ে বাম।
লুটাল রাতুল পায়!
"কে তুমি" শুধান প্রভু
হায়রে না চিনে তায়!
অফুটন্ত কলি আর ফুটন্ত সুষমা-ভরা
ভাগ্যদোষে রৌদ্রদগ্ধ অকালে জীবন্তে মরা!
"আমি যে দাসীর দাসী"—ঘুচে গেল সব ভ্রম!
"কি প্রার্থনা তব নারী?" "জান তুমি প্রিয়তম!"

বুঝিয়া বাসনা তাঁর
গৌরহরি প্রীতিভরে,
আপন খড়ম দুটি
অর্পিলেন পত্নী-করে।
বিষ্ণুপ্রিয়া নতশিরে লইলেন তাহা ধীরে
চুম্বিলা হৃদয়ে রাখি
কি আনন্দে সুমহান্!
হেরিলা বিস্ময়ে বিশ্ব
চৈতন্যের মহাদান!
ভক্তগণ আলোড়িয়া উঠে ঘন হরিবোল!
কালেরে উপেক্ষা করি জাগে আজো সে কল্লোল!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

রুদ্র।

সূর্য্যপূজা-প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি, যে "নিরুক্তবিৎ পণ্ডিতগণের মতে তিনটি দেবতা। তাহার মধ্যে অগ্নিদেবতার স্থান পৃথিবী, বায়ু বা ইন্দ্র-দেবতার স্থান অন্তরীক্ষ এবং সূর্য্য-দেবতার স্থান দ্যুলোক। এই তিন দেবতাই তাঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া বেদে নানা নামে অভিহিত ও স্তুত হইয়া থাকেন।" যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই তিন দেবতাই আবার এক দেবতার অবস্থান-ভেদ ও ভিন্ন দেবতা সকল এক মহান্ দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ। (১) ঘট-শরাবাদির আকারগত ভেদ থাকিলেও যেরূপ মৃত্তিকা-রূপে তাহারা অভিন্ন, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য দেবত্রয়ের কার্য্যাদিগত ভেদ থাকিলেও সেইরূপ তাঁহারা স্বরূপতঃ (মহান্ আত্মরূপে) অভিন্ন। (২)

নিঘণ্টু গ্রন্থে রুদ্রদেব মধ্যমস্থান-দেবতার অন্তর্গত। বায়ু বা ইন্দ্র মধ্যমস্থান-দেবতা, সুতরাং রুদ্রদেব বায়ু বা ইন্দ্র দেবতার অবান্তর ভেদ। যাস্ক বলেন, অগ্নি, ইন্দ্র বা বায়ু, ও সূর্য্য এই তিন দেবতা তাঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য্য-হেতু বহুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (৩) ইন্দ্র বা বায়ু-দেবতার কর্ম্ম শিশির ও বৃষ্টির প্রবর্ত্তন, বৃত্রবধ (মেঘ হননপূর্ব্বক বৃষ্টির নিরোধ-দূরীকরণ) ও অন্য সর্ব্বপ্রকার বলপ্রকাশক

---

(১) মহাভাগ্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। নিঃ ৭।৪।৮, ৯।

(২) অগ্নীন্দ্রসূর্য্যাণাং পরস্পরাপেক্ষমস্তত্বম্, অনন্ততঃ স্বেনৈকেন দেবতাত্মনা মহতা সহ, যথা ঘটাদীনাং মৃদা। ইতি দুর্গাচার্য্যঃ।

(৩) তাসাং মাহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। নি ৭।৫।৩

কার্য্য। (৪) রুদ্রদেব যখন ইন্দ্র বা বায়ু-দেবতার রূপভেদ তখন তাঁহার কার্য্যও ইন্দ্র বা বায়ু-দেবতার তুল্য বুঝিতে হইবে। রুদ্র-শব্দের অর্থ যাস্ক এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "রুদ্রো রৌতীতি সতঃ, রোরূয়মাণো দ্রবতীতি বা, রোদয়তে র্বা, যদরুদত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্ ইতি কাঠকম।" যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি হারিদ্রবিকম্। দুর্গাচার্য্যের বৃত্তি-অনুসারে ইহার অর্থ এইরূপ—'শব্দ করেন বলিয়া অর্থাৎ মেঘশব্দ উৎপাদন করেন বলিয়া তিনি রুদ্র, অথবা মেঘমধ্যস্থ হইয়া বারংবার শব্দ করিয়া গমন করেন বলিয়া তিনি রুদ্রঃ, অথবা শত্রুগণকে রোদন করান্ বা দুঃখ প্রদান করেন বলিয়া তিনি রুদ্র। কাঠক ব্রাহ্মণে ও হারিদ্রব ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রুদ্র। যাঁহারা বেদবর্ণিত ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বেদের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে তিনি পিতা প্রজাপতিকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্রনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সায়ণাচার্য্য বলেন যে, বেদে বর্ণিত আছে যে কোন সময়ে দেবাসুর-সংগ্রামে অগ্নিস্বরূপ রুদ্র (অগ্ন্যাত্মকো রুদ্রঃ) দেবগণ-কর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত ধন অপহরণ করিয়া প্রস্থান করেন (নিরগাৎ)। অসুরগণকে জয় করিয়া দেবগণ ইঁহাকে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পান ও তাঁহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করেন। তখন রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রুদ্র। তৈত্তিরীয়কে এইরূপ আছে।

যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত-গ্রন্থে রুদ্র-দেবতার স্বরূপ প্রদর্শনহেতু দুইটি* ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার প্রথমটির অর্থ এইরূপ,—"হে স্তোতৃবর্গ, তোমরা রুদ্রদেবের স্তব কর। রুদ্রদেব দৃঢ় ধনুঃ ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার বাণ শীঘ্রগামী, তাঁহার অস্ত্র অতীব তীক্ষ্ণ। তিনি অন্নবান্ (যজমানকে অন্ন প্রদান করেন); তিনি কাহার দ্বারা কখন অভিভূত হন না, শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন; তিনি, বিধাতা। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের স্তব শ্রবণ করুন।" দ্বিতীয় ঋক্‌টির অর্থ এইরূপ,—"হে রুদ্রদেব (বিদ্যুৎস্বরূপ) আপনার অন্তরীক্ষ হইতে বিমুক্ত অশনিরূপ অস্ত্র যাহা পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে তাহা, আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক্ (অর্থাৎ সে অস্ত্র যেন আমাদিগকে আঘাত না করে)! হে স্বপিবাত (স্বাপ্তবচন,অনতিক্রমনীয়াজ্ঞ অর্থাৎ যাঁহার আজ্ঞা কেহ অতিক্রম করিতে পারে না), তোমার যে বহু ঔষধ (সহস্রং ভেষজা) আছে তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।" ওই দুইটি ঋক তাঁহার বলকৃতি (বলপ্রকাশ কার্য্য) ও তাঁহার মধ্যমস্থানত্ব (অন্তরীক্ষে অবস্থানত্ব) প্রকাশ করিতেছে।

রুদ্রের পত্নী রোদসী, রুদ্রের পুত্র মরুদ্গণ। যাস্ক বলেন, রোদসী রুদ্রস্য (রুদ্রের) পত্নী। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেন—'রুদ্রস্য পত্নী, রুদ্রস্য বিভূতিঃ', অর্থাৎ রুদ্রের পত্নী অর্থে রুদ্রের বিভূতি (ঐশ্বর্য্য বা শক্তি) বুঝিতে হইবে। যাস্ক এইস্থানে রোদসী বা রুদ্রের পত্নীর স্বরূপ-প্রকাশক একটি ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা হইতেও রুদ্রের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারা যায়। এই ঋক্‌টীর অর্থ এইরূপ,—

"যে রথে মরুদ্গণের সহিত রমণীয় উদক

(৪) অথাস্য কার্য্যং রসানু প্রদানং বৃত্রবধো, যা চ কাচ বলকৃতিরিন্দ্রকর্ম্মৈব তৎ। নি৭।২।২

* ঋক্, ৫।৪।১৩।১ ৬৫।৫।১৩

ধারণ করিয়া রোদসী অবস্থান করিতেছেন, আমরা শীঘ্র সেই অমত্ত (যশস্বী) মারুত-বৃধকে (মেঘকে) আহ্বান করিতেছি।”*

রোদসী বা রুদ্র-পত্নীর এইরূপ বর্ণনা হইতে ধর্ম প্রবর্ত্তন—যাহা মধ্যমস্থান, দেবতার কার্য্য—তাহার সহিত রুদ্রের সম্বন্ধ আছে, দেখা যাইতেছে।

যাস্ক বলেন, বেদে অগ্নিও রুদ্রশব্দে কথিত হইয়া থাকেন (অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে)। ইহার উদাহরণ-জন্য নিরুক্তে একটি ঋক্ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার অর্থ এইরূপ,—“হে রুদ্র অগ্নি, আমাদের স্তোত্র অবগত হও (জরাবোধ), অথবা হে জরাবোধ (অর্থাৎ স্তুতিদ্বারা যজমানের অভিমত অর্থ তুমি দেবতা-গণকে অবগত করাইয়া থাক), মনুষ্য যজমান-গণের প্রতি হোতৃরূপে তোমার যজ্ঞে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন কর। তাহা হইলে যজমান মনুষ্যগণ রুদ্রস্বরূপ তোমাকে (দৃশীকম্ অর্থাৎ দর্শনীয়ম্) সুন্দর দোষশূন্য স্তোত্রদ্বারা স্তব করিবে।”† নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য এইস্থানে অথর্ব বেদ হইতে একটি ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া যাস্কের সমর্থন করিয়াছেন। এই ঋক্‌টির অর্থ এইরূপ,—“যে রুদ্র অগ্নিতে, যিনি জলের মধ্যে, যিনি ওষধি ও লতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, যিনি এই সকল ভুবন বা লোক সৃষ্টি করিয়াছেন বা সজ্জীকৃত করিয়াছেন (চাক্লৃপে) সেই অগ্নি-স্বরূপ রুদ্রের প্রতি নমস্কার প্রযুক্ত হউক।”‡ অগ্নিকে রুদ্র বলিবার কারণ এই যে অগ্নি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক, এই তিন লোকেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত, এইরূপভাবে বেদে বর্ণিত। পৃথিবীলোকে পার্থিবাগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষ-লোকে বিদ্যুদগ্নিরূপে ও দ্যুলোকে আদিত্য-রূপে তিনি বিরাজিত রহিয়াছেন। আমরা রুদ্রের স্বরূপ-প্রকাশক দ্বিতীয় ঋক্‌মন্ত্রে দেখি-য়াছি তাঁহার অশনিরূপ অস্ত্র অন্তরীক্ষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। ইহা হইতে রুদ্রের সহিত বিদ্যুতাগ্নির যে সম্বন্ধ রহি-য়াছে, তাহা বোধিত হইতেছে। যেখানে অগ্নিকে মরুদ্‌গণের সহিত যজ্ঞে আহ্বান করা হয়, সেখানে বিদ্যুতাগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ‘আমাদের চারু অধ্বরের (যজ্ঞের) প্রতি সোমপানার্থ, হে অগ্নি, আপনি আহূত হইতেছেন, অতএব মরুদ্‌গণের সহিত আগমন করুন।’*—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাস্থলে যাস্ক বলিয়া-ছেন যে এ-স্থলে মধ্যমাগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। মরুদ্‌গণ রুদ্রের পুত্র তাহা উল্লিখিত হইয়াছে রুদ্র-সূক্তে কোন কোন মন্ত্রে রুদ্র মরুদ্‌গণের পিতা, এই বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। “ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ” মরুদ্‌গণের পিতা রুদ্রের এই বাক্য(স্তুতি)কথিত হইতেছে। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য্য মরুদ্‌গণের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকার উল্লেখ

---

* বৃধং বৃ মারুতং বসং শ্রবস্যামহুবামহে।
আধশ্মিনুতস্থৌ সুরণানি বিভ্রতী সচা মরুৎসু রোদসী। ঋ, স, ৫।৫৬।৮।৩

বৃধং ক্ষিপ্রং মারুতং মেঘম্ ইতি যাস্ক।

† জরাবোধ তদ্বিবিড্‌ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্। ঋ, স, ১।২৭।১০।৫

‡ যো অগ্নৌ রুদ্রো যো অপ্স্বন্তর্য ওষধী বীরুধ আবিবেশ। য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাক্লৃপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বগ্নয়ে। অথর্ব ৭।৮৭।১

* প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে। মরুদ্ভির্ অগ্ন আগহি॥ ঋ, স, ১।১৯।১

কর্ম্মন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ ইতি যাস্ক

করিয়াছেন। আখ্যায়িকাটি এইরূপঃ—পূর্ব্বকালে কোন সময়ে ইন্দ্র অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন; তাহাতে অসুরমাতা দিতি দুঃখিত হইয়া ইন্দ্রকে বধ করিতে সমর্থ এইরূপ পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা দ্বারা স্বীয় ভর্ত্তা কশ্যপকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গর্ভলাভ করেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইন্দ্র বজ্রহস্তে সূক্ষ্ম রূপে দিতির উদরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গর্ভ সপ্তভাগে বিদারিত করেন। পরে সেই সপ্তভাগের এক এক ভাগকে পুনরায় সপ্তভাগে খণ্ডিত করেন। গর্ভের এই অংশসকল তখন উদর হইতে বহির্গত হইয়া রোদন করিতে থাকে। এক সময়ে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর লীলা-হেতু ভ্রমণ করিতে করিতে এই গর্ভাংশসকলকে দেখিতে পান। তখন পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে বলিলেন, 'যদি আপনার আমার প্রতি প্রীতি থাকে, তাহা হইলে এই মাংসখণ্ডগুলির প্রত্যেক অংশই যাহাতে এক একটি পুত্র হয়, এইরূপ আপনি বিধান করুন।' তখন পরমেশ্বর সেই মাংসখণ্ডগুলিকে সমানরূপ সমানবয়স্ক ও সমান অলঙ্কারযুক্ত পুত্র সম্পাদন করিয়া, 'এইগুলি তোমারই পুত্র হউক,' বলিয়া পার্ব্বতীকে সমর্পণ করিলেন। এই জন্যই সমস্ত মারুত-সূক্তে মরুদ্গণ রুদ্রপুত্ররূপে স্তুত হইয়া থাকেন ও রৌদ্র সূক্তে রুদ্র মরুদ্গণের পিতা বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন। একটী রুদ্র সূক্তে মরুদ্গণ এইরূপ ভাবে স্তুত ও প্রার্থিত হইতেছেন যে,—"আমাদের অভিলাষদাতা (বৃষণঃ কামানাং বর্ষিতারঃ) মরুদ্গণ! আমাদের আরোগ্যহেতুভূত আপনাদের যে নির্ম্মল (শুচীনি) ঔষধ আছে, আপনাদের যে ঔষধগুলিও অতিশয় মঙ্গলজনক ও সুখের উৎপাদক, আপনাদের যে ঔষধগুলি আমাদের পিতা মনু প্রার্থনা করিয়াছিলেন ও রুদ্রের যে ঔষধগুলি রোগের উপশমক ও ভয়ের নিবারক, আমরা আপনাদিগের নিকট হইতে সেই ঔষধগুলির কামনা করিতেছি *।" রুদ্রের স্বরূপপ্রকাশক যে দুইটীর মন্ত্রের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়টীতে আছে যে "হে রুদ্র, তোমার যে বহু প্রকার ঔষধ আছে (সহস্রং তে ভেষজা) তাহা আমাদিগকে দান কর।" এখানে মরুদ্গণের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে যে তোমাদের ও তোমাদের পিতা রুদ্রের যে সকল ঔষধ আছে, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।' প্রসিদ্ধ সুচিকিৎসক প্রাচীন কবিরাজের লোকপ্রসিদ্ধ ঔষধগুলি যেরূপ উক্ত কবিরাজের পুত্রের নিকট লোকে প্রাপ্তির আশা করে, এখানে সেইরূপ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি রুদ্রের প্রসিদ্ধ ঔষধগুলি তাঁহার পুত্রগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। রুদ্রের ঔষধের বিষয় আমরা ইহার পর পুনরায় উল্লেখ করিব।

আমরা মধ্যমস্থান-দেবতার কার্য্য জলপ্রদান, বৃত্রবধ ও বলকার্য্য, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থানে আমরা ইন্দ্র ও পর্জ্জন্য-দেবের কার্য্যের উদাহরণ প্রদর্শন জন্য দুইটী মন্ত্রের অনুবাদ করিব। ইন্দ্রের কার্য্যপ্রকাশক একটী মন্ত্র এইরূপ, "হে ইন্দ্র, আপনি মেঘকে (উৎসঃ) বিদারণ করিয়া উদকের নির্গমন-দ্বার বিবৃত (বিস্তৃত) করিয়াছেন। অভিশুক উদকভারে প্রপীড়িত (বাধমানা) মেঘ-

---

* যা বো ভেষজা মরুতঃ শুচীনি যা শন্তমা বৃষণো যা ময়োভুবানি যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শং চ যোশ্চ রুদ্রস্য বশ্মি॥—ঋক, ২।৭।১৮।১৩

সকলকে আপনি বিস্পৃষ্ট (ক্ষরিত) করিয়াছেন। অতি মহান্ পর্ব্বতকে (মেঘকে) আপনি বিবৃত (বিস্তৃত উদকদ্বারযুক্ত) করিয়া পুনঃ পুনঃ উদকধারা ক্ষরণ করাইয়াছেন। আপনি দানব বা উদক-দান-কর্ম্মশীল মেঘকে হনন করিয়াছেন।* পর্জ্জন্যের কার্য্য-প্রকাশক একটি মন্ত্র এইরূপ, "পর্জ্জন্যদেব বৃক্ষ-সকলকে বিনাশ করেন, রাক্ষসগণকে বিনাশ করেন। আমাদের সমস্ত প্রাণিসকল এই মহাবল পর্জ্জন্য হইতে ভয় পায়। মেঘশব্দকারী বর্ষণকার্য্য-সম্পাদনকারী পর্জ্জন্য দুষ্কৃত-(পাপকারী, গণকে হনন করেন। মেঘগর্জ্জন উৎপাদনপূর্ব্বক পর্জ্জন্য দেবের এইরূপ হনন-কার্য্য দেখিয়া নিরপরাধ ব্যক্তিগণ ভয় পাইয়া পলায়ন করে। (অশনিপাতে আমাদেরও প্রাণনাশ হইতে পারে, এই ভয়ে অনাবৃত স্থান হইতে পলায়ন করে)।" মরুদ্গণের কার্য্যপ্রকাশক যে মন্ত্রটি যাস্ক নিরুক্তে উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই মন্ত্রটী এইরূপ, "হে মরুদ্গণ! তোমরা বিদ্যুদ্‌যুক্ত শীঘ্র বা শোভন গতিবিশিষ্ট, অয়ুধসম্পন্ন অশ্বের ন্যায় গতিশীল (অশ্বপর্ণৈ অশ্বপতনৈঃ) রথে (মেঘে) আরোহণ করিয়া আগমন কর। হে কল্যাণকর্ম্মা (সুমায়াঃ কল্যাণ। কর্ম্মাণঃ কল্যাণপ্রজ্ঞা বা ইতি যাস্কঃ) মরুদ্গণ তোমরা আমাদের জন্য প্রভূত পরিমাণ অন্নের সহিত (বর্ষিষ্টয়া ইষা) পক্ষিগণের ন্যায় (শীঘ্র) আগমন কর।" (১)

বেদে বহু বচনান্ত রুদ্রশব্দ রুদ্রগণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহার উদাহরণ জন্য যাস্ক একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার অর্থ এইরূপ, "হে রুদ্রগণ (রুদ্রাসঃ), ইন্দ্রের সহিত তোমাদের প্রীতি রহিয়াছে (অথবা ইন্দ্র ও তোমাদের মধ্যে সমান প্রীতি রহিয়াছে), তোমাদের রথ সুবর্ণনির্ম্মিত, তোমরা যথাশাস্ত্র সম্পাদিত যজ্ঞকার্য্যে আগমন কর। আমাদের এই স্তুতি (মতি) তোমাদিগকে কামনা করিতেছে। (২) গ্রীষ্মান্তে আকাশের উৎস-স্বরূপ মেঘপ্রভব জল যেরূপ তৃষিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, সেইরূপ আমাদের স্তুতিদ্বারা অভিলষিত হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হও।" (৩)

বর্ষণক্রিয়া-সম্পাদনে যে যে প্রধান দেবতা নিযুক্ত বলিয়া বেদে বর্ণিত ও স্তুত হইয়াছেন, আমরা তাহাদের কার্য্যাবলী যাস্কপ্রদর্শিত রীতি অনুসারে বর্ণনা করিলাম। এই সকল বর্ণনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বৃষ্টি-প্রবর্ত্তন-ব্যাপারে প্রকৃতির যে যে শক্তি বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে, সেই সেই শক্ত্যধিষ্ঠাতৃপুরুষ বা চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাভাবে স্তব করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিজ নিজ অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন। সমস্ত শক্তির কেন্দ্রীভূত, সমস্ত শক্তির উৎস, সমস্ত শক্তির প্রেরক বা সমস্ত শক্তির অধিষ্ঠাতৃ পুরুষকেও রুদ্র হইতে অভিন্ন বোধ করিয়া রুদ্রনামেই তাঁহাকে তাঁহাদের

* ঋ, স, ৪।১।৩২।১

(১) ঋ, স ১।৬।১৪।১

(২) ঋ, স, ৩।৩।২১।১

(৩) দুর্গাচার্য্য-ব্যাখ্যা অনুসারে অনুবাদ।

সায়ণাচার্য্য এই অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"তৃষিত গোতমের নিকট দ্যুলোক হইতে যেরূপ উদকনিস্যন্দ প্রেরণ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের জন্য আগমন করিয়া আমাদের অভিমত প্রদান কর।"

স্তবের ও ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন। অপর প্রবন্ধে আমরা বেদোক্ত রুদ্রের আকৃতি ও প্রকৃতির আলোচনা করিয়া দেখাইব, এই বৈদিক রুদ্রদেবই পরবর্ত্তী কালে শিব ও, মহাদেবরূপে ভারতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

সোণার হার।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সেবল নিজের কাহিনী বলিতেছিলেন—"সিরুগুপ্তায় শৈশব কাটিয়া গিয়াছিল। সুখের সিরুগুপ্তা! সেই পর্ব্বত মালা, সেই নদী-স্রোত এখনও আছে। পর্ব্বতের সানুদেশ এখনও সূর্য্যকিরণে স্নাত হয়; নির্ম্মল জলের উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া ঠিক তেমনি করিয়াই আলোকের সোপান রচনা করে। কিন্তু সে আমি আর নাই।

"দুর্গার জন্মের পর মাতাঠাকুরাণী পরলোক গমন করিলেন। পিতা কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ও আমাকে এরূপ নিমগ্ন করিয়া রাখিলেন যে সে-দুঃখ, সে-অভাব বোধ করিবার অবসর পাইতাম না। দুর্গা রাজধানীতে আসিল, আমি পিতার নিকটেই রহিলাম।

"পিতা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিতেন না। রাত্রিকালে সহসা ঘুম ভাঙ্গিলে কতবার দেখিয়াছি, তিনি নিঃশব্দে শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, আমি চেতনা পাইয়াছি, বুঝিতে পারিলেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতেন।

তিনি কথা কহিতেন খুব অল্প। তাঁহার শেষ জীবনে এ স্বভাবের কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছিল। আমি তাহার কথা বলিতেছি না। তখন আমি তাঁহাকে যত ভক্তি করিতাম তাহার অধিক পরিমাণে ভয় করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে সমান পরিমাণে ভক্তি করিতে শিখিলাম যেদিন, তাহার কথা আমার এখনও মনে আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রাজরাজেশ্বর দ্বিতীয় বুরুদেব স্বর্গারোহণ করিলে পর সামন্তগণ সিরুগুপ্তায় উপস্থিত হইয়া পিতাকে সিংহাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করেন; তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমার অগ্রজের বংশে এখনও বীরের অভাব ঘটে নাই। তীরের ফলক তরবারি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও সেইরূপই তীক্ষ্ণ, সেইরূপই সাঙ্ঘাতিক। অগ্নিকণা ক্ষুদ্র হইলেও তাহার দাহিকা-শক্তি অন্তর্হিত হয় না। আপনারা আমার ভ্রাতার কনিষ্ঠপুত্র সেই বালককেই সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করুন। তাহাতে আমি অধিকতর সন্তুষ্ট হইব।" আমি পিতার এই মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। দিবানিশি এই কথা চিন্তা করিতাম এবং মনে মনে ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতাম।

"একদিন রোগশয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম পিতার বেশভূষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দেখিলাম তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ। মস্তকের কেশ রুক্ষ, উষ্ণীষহীন; কর্ণ কুণ্ডলহীন; কণ্ঠভূষণ নাই, সেই সুডৌল শোভন মুক্তা বিনির্ম্মিত গ্রৈবেয়কের স্থলে কঠিন রুদ্রাক্ষের